জলপ্রপাত
দর্পণ কবীর

এক.

রিয়াজের ঠিক পেছন থেকে একজন বাংলায় বললেন,
‘আপনি কি বাংলাদেশী?’
নায়াগ্রা ফলসের সামনে ইংরেজি ভাষাভাষী দর্শনার্থীদের ভিড়ে হঠাৎ বাংলা ভাষার প্রশ্ন গ্রীষ্মের তাতানো দাবদাহে এক পশলা বৃষ্টির মতো স্বস্তিদায়ক। রিয়াজ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। ভদ্রলোকের বয়স ৪০ হবে। মাথার চুল কমে এসেছে। শরীরের রঙ কুচকুচে কালো। চোখ দুটি মায়াবী। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ নয়, এক ধরনের সরলতা মাখামাখি। সরু ঠোঁটের ওপর মোটা গোঁফ। গোঁফটা তার মুখের সঙ্গে মানিয়েছে। অনেকের মুখে গোঁফ মানায় না। মনে হয় ছাট দেয়া একগাছি মোটাচুল। তারা কেন গোঁফ রাখেন, কে জানে। হয়তো বয়স বাড়িয়ে নিতে গোঁফ রাখেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন গোঁফ হচ্ছে পুরুষত্বের প্রতীক। ঢাকায় এফডিসির প্রধান ফটকে একজনকে প্রহরীর চাকরি করতে দেখেছে রিয়াজ। তার গোঁফ চোখে পড়ার মতো। ওই প্রহরীর গোঁফ পাক খেয়ে চিবুকের নিচ পর্যন্ত ঝুলে থাকত। তাকে দেখলে মনে হবে কোনো শৌর্য বীর্যবান পুরুষ। এফডিসির এই দারোয়ান তার গোঁফের কারণে অনেকগুলো চলচ্চিত্রে অভিনয় করার সুযোগও পেয়েছেন। আরেকজন গোঁফওয়ালা ব্যক্তির কথা মনে পড়লো ওর। তিনি একজন সাবেক সেনা কর্মকর্তা। টেলিভিশনে তাকে প্রায়ই দেখা যায়। টক-শো’তে আলোচক হিসেবে আসেন। অবসর জীবনে এসে বাংলাদেশের ওয়ান-ইলেভেনে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর গোঁফওয়ালা সাবেক সেনা কর্মকর্তা একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছিলেন। নির্বাচনেও অংশ নিয়েছিলেন। গো-হারা হেরেছেন। গোঁফ তার পরাজয় ঠেকাতে পারেনি। রিয়াজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোকের গোঁফ তাদের মতো না হলেও এক ধরনের ভারিক্কির প্রকাশ পায় এমন ঘন গোঁফ তার ঠোঁটের ওপর রয়েছে। গোঁফওয়ালা লোকটির দিকে তাকিয়ে রিয়াজ এসব কথা ভাবছিল। রিয়াজকে হা করে তাকিয়ে থাকতে দেখে লোকটি দ্বিধান্বিত হয়ে এবার ইংরেজিতে বললেন,
‘আর ইউ বাংলাদেশী?’
‘জ্বি।’
বাংলায় বলল রিয়াজ। লোকটি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তার চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হলো। বললেন,
‘যাক বাঁচলাম! ভাই আমার নাম জয়নাল। নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে থাকি।’
এ পর্যন্ত বলে জয়নাল থামলেন। তার কথায় নোয়াখালি অঞ্চলের টান আছে। রিয়াজ বুঝতে পারছে না জয়নাল তার সঙ্গে কেন কথা বলছে। এ কথা সত্যি, কোনো স্থানে বাংলা ভাষাভাষীর সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভালো লাগে। কিন্তু রিয়াজ এখন কথা বলতে স্বস্তিবোধ করছে না। ও প্রপার জন্য অপেক্ষা করছে। প্রপা যে কোনো সময় চলে আসতে পারে। জয়নাল ওর ভেতরের বিরক্তি যেন বুঝতে পারলেন। বললেন,
‘আমি জানি, আপনি ব্যস্ত আছেন। কিন্তু ভাই আমি একটা ভীষণ বিপদে পড়ে গেছি। আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন, প্লিজ!’
রিয়াজ প্রমাদ গুনল। ও বুঝতে পারল জয়নালের কোনো সমস্যা হয়েছে। রিয়াজ নিজেকে প্রস্তুত করে নিলো। কারো সমস্যার কথা শুনলে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। আর যখন কেউ ‘প্লিজ’ বলে তখন তো উপেক্ষা করার প্রশ্নই ওঠে না। রিয়াজ বলল,
‘কী সমস্যা বলুন। আপনার কী হেল্প করতে পারি?’
‘ভাই, আমি নায়াগ্রার জলে নামতে চাই। মানে, নায়াগ্রার পানিতে শিপ দিয়ে ঘুরে আসতে চাই।’
জয়নালের কথার কোনো মানে বুঝতে পারল না রিয়াজ। নায়াগ্রার জলে উভয় প্রান্ত থেকেই ছোট ছোট শিপ ছাড়ে। এসব শিপে চড়ে দর্শনার্থীরা নায়াগ্রার জলপ্রপাতের নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করে। নায়াগ্রার জল যেখানে লাফিয়ে নামছে সেখানে শিপ চলে যায়। এভাবে নায়াগ্রার জলপতনের দৃশ্য দেখার তুমুল উত্তেজনা মিশ্রিত আনন্দ আছে। জয়নাল শিপে চড়ে নায়াগ্রা দেখবে, এতে ওর সাহায্য করার কী আছে? জয়নাল কি ওর কাছে আর্থিক সাহায্য চায়? এ প্রশ্ন চিন্তার মধ্যে রেখে ও প্রশ্ন করল,

‘বলুন, আপনার কী সাহায্য লাগবে? নিঃসংকোচে বলুন। আমি আপনাকে কী সাহায্য করতে পারি?’
রিয়াজের কথায় জয়নালের মুখে বড় একটা হাসি ফুটে উঠল। বলল,
‘আপনাকে দেখেই মনে হয়েছিল আপনি সাহায্য করবেন।’
জয়নালের কথায় এবার একটু বিরক্ত হলো রিয়াজ। ওর মনে হলো, লোকটি বেশি কথা বলে। সাহায্য নেবার কথা বলে হয়তো অহেতুক ওর সময় নষ্ট করবে। কিন্তু রিয়াজের নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই। ও অপেক্ষা করছে প্রপার জন্য। প্রপা যে কোনো সময় চলে আসবে। প্রায় ৩০ মিনিট যাবত ও দাঁড়িয়ে আছে প্রপার জন্য। এই ৩০ মিনিটে ৮ বার ফোন করেছে। ৫ মিনিট আগেও ফোন করেছে ও। ওর ব্যাকুলতা প্রপা যেন ইনজয় করছে। ফোন ধরে ও প্রত্যেকবার বলেছে,
‘আমি আসছি। আর বড়জোড় ১০ মিনিট।’
প্রপা এই ১০ মিনিট সময়ের কথা ৩০ মিনিট আগেও বলেছে। প্রপার সময়জ্ঞান নিয়ে রিয়াজের সন্দেহ রয়েছে। এ পর্যন্ত ও কখনো যথাসময়ে আসতে পারেনি।
‘ভাই, কিছু ভাবছেন?’
জয়নালের কথায় চিন্তা মগ্নতা ভাঙে। রিয়াজ অস্বস্তি গলায় বলল,
‘কি হেল্প চান, বলুন।’
‘আমার স্ত্রী শিপে চড়তে ভয় পায়। আমি শিপে চড়ে ফল্‌সটা দেখে আসতে চাই। এ সময়টুকুতে আপনি কি ওকে সঙ্গ দেবেন?’
জয়নালের কথায় হচকিয়ে গেল রিয়াজ। এটা আবার কেমন হেল্প চাওয়া! ও কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় জয়নাল হাতের ইশারায় তার স্ত্রীকে ডাকলেন। ভদ্র মহিলা একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন। রিয়াজ তাকে এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি। জয়নালের ইশারায় ভদ্র মহিলা এগিয়ে এলেন। রিয়াজ মনে করেছিল জয়নালের স্ত্রীর গায়ে শাড়ি দেখবে। বোরকাও পরা থাকলেও অবাক হত না। কিন্তু জয়নালের স্ত্রী প্যান্ট ও কামিজ পরেছে। পায়ে পাম্প স্যু। জয়নালকে দেখলে মনে হয় ভীষণ কনর্জারভেটিভ ধরনের মানুষ। তার স্ত্রীর পোশাক দেখে জয়নাল সম্পর্কে এ ধারণা ভেঙে গেল। জয়নালের স্ত্রী লম্বা লম্বা পা ফেলে রিয়াজের সামনে চলো এলো। কাছে এসেই বিনীতকণ্ঠে সে রিয়াজকে সালাম দিলো।
‘স্লামালাইকুম।’
ভদ্র মহিলার কণ্ঠ রিয়াজের চেনা-চেনা লাগল। কিন্তু ও জানে, জয়নালের স্ত্রী ওর পরিচিত কেউ না। ওর মাঝে মাঝে এ রকম হয়। কারো সঙ্গে কথা বললে ওর মনে হয় খুব চেনা কেউ। কিন্তু তার নাম-পরিচয় মনে করতে পারেনা।
জয়নাল বিগলিত গলায় তার স্ত্রীর উদ্দেশে বললেন,
‘শোনো, ইনি ভীষণ ভালো মানুষ। তুমি তার সঙ্গে থাকো। আমি যাব, আর আসব।’
এই পর্যায়ে রিয়াজ আপত্তিকণ্ঠে বলল,
‘জয়নাল সাহেব, আসলে আমি একজনের জন্য অপেক্ষা করছি। সে যখন-তখন চলে আসবে। তখন আমাকে চলে যেতে হবে।’
এ কথায় বিচলিত হলো না জয়নাল। তিনি বললেন,
‘সমস্যা নেই। আপনার লোক চলে এলে, চলে যাবেন। ও এখানেই অপেক্ষা করবে। যতক্ষণ আছেন, সঙ্গে থাকলেন।’
জয়নালের কথা মন্দ লাগল না। তারপরও অস্বস্তি প্রকাশ করে বলল,
‘ঠিক আছে।’
রিয়াজের কথা জয়নাল শোনলো কি না বুঝা গেল না। তিনি হনহন করে চলে গেলেন শিপে চড়ার প্রবেশ পথের দিকে। স্বামীর চলে যাওয়া পথের দিকে কিছুক্ষণ চেয়েছিলেন জয়নালের স্ত্রী। তিনি একটা অকারণ দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। এরপর রিয়াজের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন,
‘আপনার নাম রিয়াজ, তাই না?’
রিয়াজ অবাক চোখে জয়নালের স্ত্রীর দিকে তাকাল। জয়নালের স্ত্রী যেন মজা পেলো ওর অবাক হওয়ায়। সে মুখে এক ফালি হাসি ফুটিয়ে বলল,
‘আপনি অবাক হচ্ছেন? আর আমি অবাক হয়েছি আমাকে আপনি চিনতে পারেননি বলে।’
এবার যেন বিস্ময়ের ধাক্কা এসে লাগল। রিয়াজ জয়নালের স্ত্রীর মুখের দিকে তীর্যক দৃষ্টি রাখল। ভদ্র মহিলা মিটিমিটি হাসছেন। রিয়াজ বলল,
‘আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি, মনে করতে পারছি না!’

‘যাক বাবা, অন্তত তা-ও বললেন, কোথায় যেন দেখেছি। আমি তো ভেবেছিলাম, আকাশ থেকে পড়ার ভান করবেন।’
‘আপনি কে, বলুন তো?’
এ কথায় জয়নালের স্ত্রী মিষ্টি করে হাসলেন। ভদ্র মহিলা যথেষ্ট সুন্দরী। আয়ত চোখ। নাক টিকালো না হলেও, খারাপ নয়। চিবুকে একটা তিল আছে। স্পষ্ট বোঝা যায়। তিলটি এক ধরনের সৌন্দর্যের প্রতীক। আকর্ষণ সৃষ্টি করে। তিলটির দিকে তাকিয়ে ওর মনে হলো এই মুখ খুব চেনা চেনা। ওর স্মৃতির আয়না থেকে ঘন কুয়াশা সরে যাচ্ছে। স্পষ্ট হচ্ছে ভোরের সূর্যালোক। ও নিজের সবটুকু স্মৃতিশক্তি দিয়ে ভদ্র মহিলাকে চেনার চেষ্টা করতে লাগলো। চেনা মুখ চিনতে না পারার কষ্টের চেয়ে লজ্জা বেশি। স্মৃতি হাতরাতে হাতরাতে ও বলল,
‘আপনাকে ব্রুকলিনে কোথাও দেখেছি। কোথায় বলুন তো? কোনো স্টোরে? ডানকিনে কাজ করতেন?’
রিয়াজের কথায় ভ্রু কপালে তুলে স্মিত হাসলেন জয়নালের স্ত্রী। জবাবে বললেন,
‘যাক, অনেকটা পেরেছেন। আমাকে ব্রুকলিনে দেখেছেন কলমিলতা গ্রোসারিত। আপনি প্রতি শুক্রবার ওই গ্রোসারিতে যেতেন। শুক্রবার আমার সঙ্গে আপনার দেখা হতো। মনে পড়ছে?’
এ কথা শোনার পরপরই রিয়াজ জয়নালের স্ত্রীকে চিনতে পারল। এতক্ষণ তাকে চিনতে না পারার জন্য রিয়াজের খুব লজ্জা লাগল। জয়নালের স্ত্রীর নাম শায়লা। শায়লার সঙ্গে রিয়াজের ফের দেখা হলো প্রায় দু’বছর পর। ওর সঙ্গে পরিচয়টা যে খুব বেশি অর্থপূর্ণ, তা নয়। রিয়াজ আগে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রতি শুক্রবার ডেলিভারি দিতো ব্রুকলিনে। সেসময় পরিচয় হয় শায়লার সঙ্গে। শায়লা কলমিলতা গ্রোসারিতে চাকরি করতো। রিয়াজ যেত সদ্য প্রকাশিত পত্রিকা রেখে আগের সপ্তাহের অবিক্রিত পত্রিকা ফেরত আনতে। গত সপ্তাহের যে ক’টি পত্রিকা বিক্রি হতো, হিসাব করে এর অর্থও নিতো রিয়াজ। রিয়াজ এই একদিনের কাজটি করেছে ৪ মাস। ৪ মাসে ১৬ বারের মতো ওর শায়লার সঙ্গে দেখা হয়েছে। দু’বছর পর শায়লাকে একজনের স্ত্রী পরিচয়ে দেখে চিনতে না পারলে খুব বেশি অবাক হবার কিছু নেই, মনে মনে ভাবল রিয়াজ।
‘কী ভাবছেন?’
‘কিছু না।’
‘না, আমি জানি, আপনি আমার কথা ভাবছেন।’
চেখের দৃষ্টিতে কেমন রহস্য ছড়িয়ে কথাটি বলল শায়লা। রিয়াজ একটু বিব্রত হলো। ও বলল,
‘না, ভাবছিলাম, আমাকে যখন দেখেছি, তখন একরকম ছিলেন। আর এখন অন্যরকম।’
‘কী রকম?’
‘এই যে আগে ছিলেন অবিবাহিতা। এখন বিবাহিতা। একটা পরিবর্তন তো আছে।’
এ কথায় খিলখিল করে হেসে উঠল শায়লা। ওর হাসি থামার পর রিয়াজ বললো,
‘এমন করে হাসলেন কেন?’
‘হাসলাম এমনিতেই। আমাকে হাসানোর জন্য ধন্যবাদ।’
কথা বলতে গিয়ে শায়লার কণ্ঠ একটু ভার হয়ে আসে। রিয়াজ কী বলবে, বুঝতে পারলো না। যে শায়লাকে ও ভালো করে চেনে না, সেই শায়লা মাত্র কয়েক মুহূর্তে কেমন ওর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। শায়লা রিয়াজের দিকে তাকিয়ে অভিযোগের সুরে বলল,
‘আচ্ছা, আপনি হঠাৎ করে পত্রিকা ডেলিভারি বন্ধ করে দিয়েছিলেন কেন?’
‘ওটা ছিল একদিনের অডজব। টাকার প্রয়োজনে করেছি। নেটওয়ার্কিংয়ের ওপর গ্রাজুয়েট শেষ হলো। এরপর একটা ভালো জব পেয়ে গেলাম, তাই ছেড়ে দিই ওই কাজ। কেন?’
‘না, প্রতি শুক্রবার আমাদের স্টোরে আসতেন, কথা হতো। হঠাৎ করে আসা বন্ধ করে দিলেন। কোনো খোঁজ-খবর নেননি। তাই কথাটি জিজ্ঞেস করলাম।’
শায়লার কথায় কেমন একটা কৌতুহল সৃষ্টি হলো। শায়লা কি রিয়াজের জন্য অপেক্ষা করতো? প্রশ্নটি মনে আসতেই ওর মধ্যে অস্বস্তির ঝাপটা লাগলো। ও বলল,
‘আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।’
‘কি বুঝতে পারছেন না?’
‘আপনার কথা?’
‘বুঝতে পারলে কি হবে?’
‘কি হবে মানে?’

‘মানে কচু! আপনার কচু হবে!’
এ কথা বলে ফের খিলখিল করে হেসে উঠল শায়লা। রিয়াজের ভেতরে অজানা ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত বইতে লাগল। প্রপা যখন-তখন চলে আসবে, আর ও দাঁড়িয়ে আছে শায়লা নামক এক রহস্যের সামনে। শায়লা কি ওর মনের কথা জানতে পারলো? ও রহস্যভরা চোখ ওর চোখে রেখে বলল,
‘আপনি ভড়কে যাচ্ছেন?’
রিয়াজ বলল,
‘জয়নাল সাহেবকে কবে বিয়ে করলেন? তিনি কী করেন?’
রিয়াজের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো শায়লা। এমন দৃষ্টির সামনে পড়েনি রিয়াজ। ও শায়লার মুখের দিকে চেয়ে রইলো, যেন প্রশ্নটির জবাব ওর চাই। শায়লা ওর চোখে চোখ রেখে বলল,
‘জয়নাল হচ্ছে কলমিলতা গ্রোসারির মালিক। আমি তার কর্মচারী ছিলাম, এখন স্ত্রী। গত বছর আমরা বিয়ে করেছি।’
‘ওহ, আচ্ছা ! তবে জয়নাল সাহেবের বয়স..!’
‘হ্যাঁ, বয়স একটু বেশি, তাতে কি?’
‘একটু নয়, মনে হচ্ছে অনেক বেশি।’
‘এখানে তো হরহামেশা তাই হচ্ছে। অনেকে দেশে গিয়ে কিশোরী মেয়ে বিয়ে করেন। জয়নাল না হয় এখানে করেছেন।’
‘হুম্। তা-ও ঠিক।’
‘এখানে তো অনেকে বিয়েও করতে পারেন না। আইবুড়া হয়ে যাচ্ছে। তাই না?’
শায়লার কথার মধ্যে কেমন একটা খোঁচা আছে। রিয়াজ এর কোনো জবাব দিল না। শায়লার সঙ্গে এতো কথা বলাটা ঠিক হচ্ছে কি-না ও একটু ভাবতে লাগল। রিয়াজের চুপসে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে শায়লা বলল,
‘আপনি কেমন আছেন?’
‘ভালো।’
‘কী করছেন?’
‘একটা ভালো জব করছি।’
বলল রিয়াজ। শায়লা চোখ কপালে তুলে বলল,
‘আপনার তো কাগজ ছিল না। হয়ে গেছে?’
শায়লার কথায় চমকে উঠল রিয়াজ। রিয়াজের ওয়ার্কপারমিট নেই, এ কথা ও জানে কী করে। রিয়াজ কি কখনো ওকে এ কথা বলেছিল?
‘কী ভাবছেন?’
‘না, কিছু না।’
‘আমি জানি, আপনি ভাবছেন।’
‘কি?’
‘ভাবছেন, আমি আপনার স্টাটাসের কথা কি করে জানি, তাই না?’
‘হ্যাঁ, কি করে জানেন?’
‘আপনার সম্পর্কে আমি আরো অনেক কথাই জানি।’
‘কী করে?’
‘খোঁজ নিয়েছিলাম। জানার ইচ্ছে থাকলে জানা যায়। আমার জানার ইচ্ছে ছিল, জেনেছি। ব্যস্।’
রহস্য থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে শায়লা। অপরদিকে রহস্যের দিকে যেন এগিয়ে যাচ্ছে রিয়াজ। এই মুহূর্তে শায়লার সঙ্গে কথা বলতে ওর ভালো লাগছে। যদিও যে কোনো সময় প্রপা চলে আসতে পারে, তবু এ নিয়ে ওর ভেতরের জড়তা কমে আসছে। রিয়াজ বলল,
‘যাক। দেরিতে হলেও জানতে পরলাম, আপনি আমার খোঁজখবর রাখতেন।’
‘সবসময় রাখতাম ঠিক নয়। একটা সময় পর্যন্ত খোঁজ নিয়েছি। কিন্তু আপনার খোঁজ সব সময় রাখতে পারিনি। আজ যখন আপনাকে এখানে দেখলাম, তখন মনে হলো আপনার সঙ্গে কথা বলি।’
‘তাই নাকি!’

‘হ্যাঁ। আমি জয়নালকে বললাম শিপে চড়ব না। আমি সাঁতার জানি না, আমার ভয় লাগে। জয়নাল একাই শিপে চড়তে রাজি হয়ে গেল। এবং চলেও গেল।’
‘মাই গড! এ দেখছি সাজানো নাটক।’
‘নাটক! কিসের নাটক?’
‘এই যে আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য নাটক তৈরি করলেন?’
‘ওটা নাটক নয়, অজুহাত। আপনি আগের মতো বোকাই আছেন!’
‘তাই নাকি? আমি কি খুব বোকা!’
‘হুম্। অন্তত আমার তাই মনে হয়।’
এ পর্যায়ে ওরা দু’জনে চুপ হয়ে গেল। ওদের মধ্যে গুমোট মৌনতা নেমে আসল। এই মৌনতার কুয়াশা সরিয়ে শায়লা আলতো গলায় বলল,
‘আপনার কাগজ হয়ে গেছে– এ কথাটাও জানাতে পারতেন।’
শায়লার কথাটির মধ্যে অভিমান ফুটে উঠল। রিয়াজ কী করে বলবে, ও আই ২৫ অর্থাৎ সিএসএ লুলাক কর্মসূচিতে ঢুকেছে। এই কর্মসূচিতে প্রবেশের সুযোগ পেলে আবেদনকারী তাৎক্ষণিকভাবে বৈধ কাগজ পায় ঠিক, এর চূড়ান্ত পরিণতি কী হবে, কেউ জানে না। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সামনে এ হচ্ছে এক ধরনের সাময়িক বৈধতা লাভ। সিএসএ লুলাকে আবেদন করে এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যারা ডকুমেন্টেড ইমিগ্র্যান্ট হচ্ছেন বা বৈধতার কাগজ পাচ্ছেন, তারা বৈধ অভিবাসীর সকল সুবিধা ও অধিকার ভোগ করলেও ওই অভিবাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে যেতে ভয় পাচ্ছেন। যারা নিজ নিজ দেশে বা অন্যদেশে যাচ্ছেন, যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সময় তারা মুখোমুখি হচ্ছেন ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের কড়া প্রশ্নবাণে। অনেককে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে দেয়নি ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ। এরপর থেকে সিএসএ লুলাক কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্তরা আর নিজ দেশে যাওয়ার কথা ভাবেন না। এই বৈধতার আড়ালে কতটা আশঙ্কা ও বেদনা জড়িয়ে রয়েছে, সে কথা আর কতজন জানে? এমন বৈধতার কথা বলে বেড়ানোর কী আছে? ভাবলো রিয়াজ। ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল শায়লা। রিয়াজের কোনো জবাব না পেয়ে ও বলল,
‘আপনি কিছু ভাবছেন? আমার অভিযোগটা কি বেশি হয়ে গেল?’
‘না, তেমন নয়। তবে...?’
‘তবে কি?’
‘ভাবছি, আমার প্রতি আপনার এমন কৌতূহল ছিল, তা জানতাম না।’
‘জানলে কী করতেন?’
ঠোঁট উল্টিয়ে প্রশ্ন করল শায়লা। এর জবাবও দিতে পারল না রিয়াজ। শায়লার কথার কেমন একটা মাদকতা আছে। এই মাদকতার টানে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়া যায় না। এ কথাটি ভাবার সময় সেলফোন বেজে উঠল। রিয়াজ শায়লার কাছ থেকে কয়েক পা দূরে সরে গিয়ে সেলফোনের কল রিসিভ করল,
‘হ্যালো...।’
ফোনের ও প্রান্তে প্রপার কণ্ঠ রিনরিনিয়ে ওঠে।
‘এই, তুমি কোথায়?’
‘আমি তো তোমার জন্য সেই কখোন থেকে অপেক্ষা করছি। ফলসের যেখান থেকে শিপে ওঠে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছি। চলো আসো।’
‘না, না। আমি যদি তোমাকে খুঁজে না পাই! আমি হোটেলের লবিতে আছি। তুমি এসে আমাকে নিয়ে যাও, প্লিজ!’
‘নো-প্রবলেম, ডার্লিং, আমি আসছি।’
‘ওকে, আই এ্যাম ওয়েটিং ফর ইউ।’
ফোন রাখলো প্রপা। রিয়াজ শায়লার সামনে এগিয়ে গিয়ে বিনীত গলায় বলল,
‘আমাকে এখুনিই যেতে হবে। সরি, আপনাকে আর সময় দিতে পারলাম না।’
‘ইটস ওকে। আপনি যান।’
বলে হাসলো শায়লা। রিয়াজ বলল,
‘আপনার সঙ্গে হয়তো আবার দেখা হবে। আসি।’

এর জবাবে শায়লা কিছু বলল না। ও মুখ টিপে হাসলো। ওর হাসিতে নায়াগ্রা ফলসে যে রঙধনু সৃষ্টি হয়, সেই রঙধনুর সাত রঙের লাবন্য ঝিলিক দিয়ে উঠল। হনহন করে হেঁটে যেতে যেতে রিয়াজ শায়লার হাসি মনের ক্যানভাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করল বারবার। কিন্তু শায়লার হাসিটা বারবার ওর মনে ভেসে উঠতে লাগল।

দুই.

ম্যানহাটানকে কেন যে পৃথিবীর রাজধানী বলে, এর কোনো মানে খুঁজে পায় না অলক। ম্যানহাটান জুড়ে আকাশমুখি বড় বড় দালান রয়েছে, এটা ঠিক। কিন্তু নগর সভ্যতার আড়ালে এখানে কী হচ্ছে না? শুক্র ও শনিবার নাইটক্লাব ও বারগুলোতে মাতালদের কাণ্ড দেখলে নাগরিক জীবনে ‘সভ্যতা ও শালীনতা’ আছে কী নেই, তা ভেবে ভিড়মি খেতে হয়। ম্যানহাটানের রাস্তায় ইয়োলো ট্যাক্সিক্যাবগুলো ছুটে বেড়াচ্ছে বন্য ষাঁড়ের মতো। এই শহরের কোথাও কোথাও রাস্তার এমন বেহাল অবস্থা যে, ঢাকা শহরের রাস্তার খানাখন্দের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আছে ট্রাফিক জ্যামের বিড়ম্বনাও। ইস্ট রিভার ও হার্ডসন রিভার পরিবেষ্টিত ম্যানহাটান শহরটি উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে আপটাউন, মিট টাউন এবং ডাউন টাউন নামে তিনভাবে বিভক্ত। সারি সারি বহুতল ভবনের নগর সৌন্দর্যের আকর্ষণটাই যা আছে! হিসেব করে বলতে গেলে ডাউন টাউনে ওয়াল স্ট্রিটের বাণিজ্যিক কার্যক্রম, চায়না টাউনে সুলভ মূল্যের পসরা, ইস্ট ও ওয়েস্ট ভিলেজের নাইটক্লাব, নদীর তলদেশে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া ট্যানেল, আম্পেয়ার স্ট্রিট সুউচ্চ বহুতল ভবন, টাইমস স্কোয়ারের জনস্রোত ও রাতের আলো জ্বলমলে জৌলুস, ব্রডওয়ের থিয়েটার এবং গাছপালার সমারোহে সেন্ট্রাল পার্ক ছাড়া এই ছোট্ট শহরটির তুলনা করার মতো আর কী আছে? এর আপটাউনে তো কৃষ্ণাঙ্গদের উচ্ছৃঙ্খলতার কারণে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা অনেকদিন যাবত প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে আছে। এই শহরের অতুলনীয় বিশেষত্ব যে, এই শহর কখনো ঘুমায় না। এখানে দিন বা রাতের ফারাক খুব একটা নেই। অধিকাংশ এলাকায় দোকানপাট ২৪ ঘণ্টা খোলা। সারারাত লোকজনের চলাচল রয়েছে। একটি শহর দিনরাত সর্বক্ষণ জেগে আছে বলেই কি শহরটি পৃথিবীর বাণিজ্যিক রাজধানী হিসাবে পরিগণিত হবে? এ প্রশ্ন অলকের মনে প্রায় উঁকি দেয়। অলক জানে ম্যানহাটানে পৃথিবীর অনেক দেশের বড় বড় বহুজাতিক কোম্পনির কার্যালয় রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি এই শহর থেকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কি না, তা জানে না ও। তবে ম্যাহাটানকে পৃথিবীর বাণিজ্যিক রাজধানী বলার পক্ষে ও কখনো নিজের সমর্থন খুঁজে পায় না। এ শহরকে ওর ‘ভীষণ গিঞ্জি একটি শহর’ বলে মনে হয়। দিনের বেলায় অফিস আওয়ারে তো ম্যানহাটানে হাঁটাই যায় না। রাস্তাগুলো মানুষে ঠাসাঠাসি! সবাই ছুটছে যন্ত্রের মতো। দিনের যে কোনো সময়ে গ্র্যান্ডসেন্ট্রাল রেল স্টেশনের আশপাশে গেলে দেখা যাবে বিভিন্ন পথে ছুটে যাচ্ছে মানুষের কাফেলা। এ কাফেলার মানুষগুলোর মুখ একেকটি একেক রকম। বহুজাতিক মানুষের খরস্রোত ভেসে যায় প্রতিদিন। এ শহরকে বহুজাতিক সংস্কৃতির মিলনমেলার তীর্থস্থান বলা যায়। মধ্য ম্যানহাটানে রকোফেলার প্লাজা সেন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে কথাগুলো ভাবছিল অলক। আর কিছুক্ষণের মধ্যে জেনিফার ওর অফিস থেকে বেরিয়ে আসবে। লাঞ্চ ব্রেকে ঘণ্টাখানেকের আড্ডা হবে দু’জনের। ওদের মধ্যে বন্ধুত্ব বা প্রেমের সূচনা পর্বের একরকম আনুষ্ঠানিকতার আড্ডা। অলকের আজ সাপ্তাহিক ছুটির দিন। ও টেলিফোনে জেনিফারকে লাঞ্চের অফার দিয়েছিল কাল। জেনিফার সানন্দে ওর অফার গ্রহণ করেছে। জেনিফার এত সহজে রাজি হয়ে যাবে ভাবেনি ও। অলকের সঙ্গে জেনিফারের পরিচয় হয়েছে মাত্র ৪দিন আগে। পরিচয়ের ঘটনায় একটু ভিন্নমাত্রাও রয়েছে। এ মুহূর্তে জেনিফারে সঙ্গে ওর পরিচয়ের কথা ভেসে উঠল মনের পর্দায়। সেদিন রাতে অলক ম্যানহাটান থেকে বাসায় ফেরার সময় অন্য মনষ্কতায় কুইন্সগামী এফ ট্রেনে না উঠে ব্রুকলিনগামী এফ ট্রেনে চড়ে বসে। মধ্যরাত বলে ট্রেনের কামরায় বেশি যাত্রী ছিল না। অলকের বিপরীত দিকে বসেছিল জেনিফার। ওর পরনে ছিল সাদা শার্ট ও নীল স্কার্ট। পায়ে হাইহিল। বুকের সামনে টপসের বুতাম খোলা। ওই দিকে চোখ যেতেই অলকের বুকের ভেতরে ঝড় উঠে গেল। স্বর্ণকেশী এই সুন্দরী একটা ম্যাগাজিনে মগ্ন ছিল। অলক কেন জানি জেনিফারের দিক থেকে চোখ সরাতে পারছিল না। ট্রেনটি বড়হল স্টেশনে আসতেই ট্রেনের কামরা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। এখানে অলক নেমে যেত এবং বিপরীত দিকের প্লাটফর্ম থেকে কুইন্সগামী এফ ট্রেন ধরত। কিন্তু জেনিফারের দিকে তাকিয়ে ও সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ফেলল। বড়হল স্টেশন থেকে যখন ট্রেনটি ছাড়ল তখন ওদের কামরায় মাত্র ৬ জন যাত্রী। অলক ও জেনিফার যেখানে বসেছে, সেখানে আর কোনো যাত্রী নেই। অলক একটু নড়েচড়ে বসল। ঠিক এ সময় ম্যাগাজিন থেকে চোখ তুলল জেনিফার। অলকের দিকে তাকাতেই অলক অকারণে যেচে ওকে ‘হাই’ বলল। জেনিফার ভ্রুক্ষেপ করলো না। অলক দমে যায় না। সে চালাকি করে জেনিফারের উদ্দেশে বলল,
‘এক্সকিউজ মি, আই থিংক সো, ডোন্ট ইউ ড্যান্স এট ব্রডওয়ে অ্যান্ড ফিফটি টু?’

এ কথায় জেনিফার কণ্ঠে বিরক্ত তুলে বলল,
‘হোয়াট?’
অলক মনে মনে খুশি হলো যে, ওর কথায় জেনিফার বিরক্ত হলেও রেসপন্স করেছে। সাধারণত অপরিচিতদের অযাচিত আলাপে সাড়া দেয় না মেয়েরা। অলক গলা খাকারি দিয়ে জড়তা প্রকাশ করে বিনীত কণ্ঠে বলল,
‘ম্যা বি আই এম রং। বাট এ গার্ল হু লুকস লাইক ইউ, হু পারফর্ম এট এ নাইট ক্লাব!’
‘সো!’
অলক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মেয়ের সঙ্গে যে মিথ্যা গল্প ফাঁদে, সেই গল্পের অবতারণা করার চেষ্টা করতে বলল,
‘নাথিং। আই কান্ট ইমাজিন, দেয়ার আর টু উইম্যান লিভিং দিস সিটি উইথ সেম আউটলুক! ডু ইউ হ্যাভ টুইন সিস্টার? ডোন্ট সে ইট ইজ ইওর পার্সোনাল ম্যাটার, প্লিজ!’
এ কথায় জেনিফার স্মিত হাসল। ও বলল,
‘আই ডোন্ট হ্যাভ এনি টুইন। ম্যা বি ইউ স সামওয়ান, হু লুকস লাইক মি।’
‘ম্যা বি। ইফ ইউ সি হার ইউ উইল বি সারপ্রাইজ টু!’
এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে জেনিফার মুখ টিপে হাসল। ও বোঝাতে চাইলো অকারণ কথা বাড়াতে ও আগ্রহী নয়। কিন্তু অলক ওর মনোভাবকে তোয়াক্কা করে না। যেভাবে হোক মেয়েটির সঙ্গে গল্প জুড়ে দিতে হবে, ভাবে ও। নিজের মধ্যে নিজেকে প্রস্তুতও করে তোলে। জেনিফার ম্যাগাজিনের পাতায় চোখ বুলাচ্ছিল। অলক গায়ে পড়ে কথা বলার মতো আবার বলল,
‘ইফ ইউ ডোন্টমাইন্ড, আই লাইক টু ইউ সে সামথিংক’।
‘হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?’
‘হোয়াট ইজ ইওর ন্যাম? ইনফ্যাক্ট, ইফ আই সি দ্য গার্ল এগেইন, আই কুড টক এবাউট ইউ। মে বি শি মাইট আস্ক ইওর ন্যাম’।
কথাটা বলে অলক সরলতার দৃষ্টি মেলে জেনিফারের দিকে তাকিয়ে রইলো। ওর মন বলছে জবাব পাবে ও। ওর ধারণা সত্যি হলো। জেনিফার বলল,
‘আই এ্যাম জেনিফার।’
‘লট অব থ্যাংকস।’
‘ওয়েল কাম।’
‘ইফ ইউ ডোন্টমাইন্ড, ম্যা আই লাস্ট ওয়ার্ড?’
‘গো এহেড।’
বলে জেনিফার ম্যাগাজিন গুটিয়ে অলকের চোখে চোখ রাখলো। অলক মুগ্ধকণ্ঠে বলল,
‘ইউর আইজ আর ভেরি অ্যাট্রাক্টিভ!’
‘রিয়েলি! থ্যাংকস ফর কমেন্ট।’
মিষ্টি করে হাসলো জেনিফার। অলক কথা ছেড়ে দিতে চায় না। ও বলল,
‘আই সি বিউটি অফ তাসমান সী ইন ইওর আইজ!’
অলকের এ কথার জবাবে কৌতূহল প্রকাশ করে জেনিফার বলল,
‘হয়ার দ্যা তাসমান সী? ’
‘অস্ট্রেলিয়ায়। ডিড ইউ গো টু অস্ট্রেলিয়া?’
‘নো।’
‘ইফ ইউ হ্যাভ টাইম, ইউ কুড ভিজিট অস্ট্রেলিয়া। তাসমান সী সো ব্লু! ইউ উইল ফিল অল দ্য বিউটি অব দ্য ওয়ার্ল্ড আর সাবমারজিং!’
জেনিফার কৌতূহল প্রকাশ করে বলল,
‘হোয়াই ডোন্ট ইউ থিংক আটলান্টিক? আটলান্টিক সী ইজ এজ বিউটিফুল এজ তাসমান সী?’
এর জবাবে অলক মনে মনে বলল, ‘পৃথিবীর সব সমুদ্রের সৌন্দর্য প্রায় এক। কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা বলার আমার তো একটা কৌশল দরকার।’ ও জেনিফারকে বলল,
‘দ্য বিউটি অব দ্য তাসমান সী ইজ মোর লাইক ইউর আইজ! ইউর বিউটি ইজ সো কোম্পেলিং--! ট্রাস্ট মি!’

এ কথায় জেনিফার হেসে বলল,
'আর ইউ ফ্লাট মি? হোয়াই?'
এ কথায় অলক বিব্রত হলেও মুখে তা প্রকাশ করল না। ও বিগলিত গলায় বলল,
'রিয়েলি, ইউর আইজ আর ভেরি অ্যাট্রাক্টিভ! পুলিং মি এ ওয়ে। আই কান্ট রেজিস্ট মাইসেলফ নট টকিং টু ইউ!'
জেনিফার এ কথার জবাব দিলো না। অলকের মনে হলো জেনিফার আর কথা বাড়াতে চায় না। ট্রেন হেলেদুলে ছুটে চলছে। এর মধ্যে কয়েকটি স্টেশন পার হয়েছে। অলক নিজের মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনা টের পাচ্ছে। ও জানে, জেনিফারের সঙ্গে যেটুকু আলাপ হয়েছে, তা-ই যথেষ্ট। এখন শুধু ফন্দি আঁটতে হবে। আর কী বলা যায়, তাই ভাবছিল অলক। ট্রেন কনি আইল্যান্ড স্টেশনে এসে থামতেই জেনিফার নেমে যেতে সিট থেকে উঠে দাঁড়াল। অলকও চট করে উঠে দাঁড়াল। জেনিফার নেমে যেতেই ট্রেন থেকে নেমে ওকে অনুসরণ করল অলক। জেনিফারের পাশে যেতে যেতে ও বলল,
'দিস প্লেস ইজ ভেরি কোয়াইট!'
জেনিফার অলকের উদ্দেশে বলল,
'ডু ইউ লিভ এরাউন্ড হেয়ার?'
'নো, আই লিভ ইন কুইন্স।'
বলল অলক। অলকের কথায় থমকে দাঁড়াল জেনিফার। অলকও থামল। জেনিফার অলকের দিকে চেয়ে বলল,
'সো, হোয়াই ইউ গেট অব হেয়ার?'
এ প্রশ্নটার অপেক্ষা করছিল অলক। ও বলল,
'আই অ্যাম গেট অফ হেয়ার, বিকোউজ, আই স ইউ গেটিং অব হেয়ার! আই থট, আই শুড গিভ ইউ কোম্পানি।'
'স্ট্র্যাঞ্জ!'
বিস্ময় প্রকাশ করে জেনিফার। অলক যেন নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ পাচ্ছে। ও বলল,
'একচুয়েলি, আই ডোন্ট হ্যাভ এনিথিং টু ডু। সো...!'
জেনিফার অলকের কথা শেষ হবার আগে বলল,
'ইফ ইউ গো টু কুইন্স, ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য ট্রেন ফ্রম আদার সাইড।'
'আই নো। বাট আই ডোন্ট গো টু কুইন্স টু-ডে। আই ওয়ান্ট টু ওয়াক হোলনাইট!'
'স্ট্র্যাঞ্জ! আর ইউ ক্রেজি?'
এ কথা বলে জেনিফার ফের হাঁটতে লাগল। অলকও ওকে অনুসরণ করল। হাঁটতে হাঁটতে ও বলল,
'আই উইল রিটার্ন হোম, আফটার আই ড্রফঅব ইউ এট ইওর হোম।'
জেনিফার হাঁটতে হাঁটতে অলকের উদ্দেশে বলল,
'হোয়াট ইজ ইউর বেনিফিট হেয়ার?'
'দিস ইজ নট কোশ্চেন অব লস অ্যান্ড বেনিফিট। আই জাস্ট ওয়ান্ট টু প্লিজ মাইসেলফ মোর লুকিং এট ইওর বিউটি! আর ইউ বদার?'
প্রশ্ন করল অলক। জেনিফার বলল,
'আই ওয়াজ, বাট নট নাউ।'
'থ্যাংকস, জেনিফার।'
'ওয়েল কাম। বাই দ্যা ওয়ে, হোয়াট ইজ ইওর ন্যাম?'
'অলক রয়। নিক ন্যাম অ্যালেন। ইউ ক্যান সে অ্যালেন।'
'অ্যালেন, গো টু ইওর হোম। হোয়াই ডু ইউ ওয়াক এরাউন্ড ফরনাথিং সো লেট নাইট? দেয়ার কুড বি স্ট্রম লেট এট নাইট! ওয়েদার রিপোর্ট সে লাইক দিস!'
জেনিফারের এ কথায় অলক আরেকটি মিথ্যা তৈরি করে নিলো। ও বলল,
'একচুয়েলি, আই লস্ট মাই হোম কী। আই কান্ট থিংক ব্রিডিং দ্য ডোর। আই উইল কল লকস্মিথ এট মর্নিং। সো, হোয়াট অপশন আই হ্যাভ বিসাইড ওয়াক এরাউন্ড?'
অলকের কথায় একটু বদলে গেল কি জেনিফার? প্রশ্নটা অলকের মনে জাগলেও অন্ধকারে সে জেনিফারের মুখের ভাব দেখতে পেল না। অলক একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। যেন সারারাত ঘুরে বেড়াতে হবে বলে এক ধরনের কষ্ট হচ্ছে।

জেনিফারের বাসা ট্রেন স্টেশন থেকে খুব বেশি দূরে নয়। ও একটি বড় অ্যাপার্টমেন্ট হাউজের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে গেলো। অলকের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল,

'অ্যালেন, দেয়ার হ্যাভ মাই হোম। লট অব থ্যাংকস টু টাইম উইথ মি।'

'ওয়েল কাম। গেট ইন ইনসাইড।'

'ওকে। বাই দ্য ওয়ে, ইউ আর ফানি।'

জেনিফারের কথায় অলকের মুখে আকর্ণবিস্তীর্ণ হাসি ফুটে উঠল। জেনিফার একটু ভেবে ফের বলল,

'আর ইউ রিয়েলি ওয়াক এরাউন্ড হোল নাইট! ইউ কুড গেট ইন এনি হোটেল অর মোটেল?'

এ কথার কোনো জবাব দিল না অলক। ও বলল,

'জেনিফার, ইউ আর ভেরি সফট হার্ডেড পারসন! ভেরি হিউম্যান বিং। লটস অব থ্যাংকস টু থিংক অ্যাবাউট মি।'

এ কথায় জেনিফার লজ্জা পেল যেন। অলক মনে মনে প্রহর গুনছে। ও জেনিফারের দিকে তাকিয়ে অসহায় গলায় বলল,

'গেট ইন ইওর হোম, জেনিফার।'

জেনিফার ওর দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলো। মনে হলো অলককে পর্যবেক্ষণ করছে। এরপর ও বললো,

'ইফ ইউ উইশ, ইউ ক্যান গেট ইন মাই হোম অ্যান্ড ইউ ক্যান স্লিপিং ইন মাই লিভিংরুম।'

এমন প্রস্তাব মনে মনে আশা করছিল অলক। কিন্তু সত্যি সত্যি জেনিফার এ প্রস্তাব দেবে, ভাবেনি। জেনিফারের প্রস্তাবটা পেয়ে ওর বুকের ভেতর এক ধরনের তোলপাড় শুরু হলো। ও মুখে গাম্ভীর্য ধরে রেখে বিনয়ী গলায় বলল,

'আর ইউ শিউর! ক্যান আই স্টে হেয়ার?'

জেনিফার হাসলো। বলল,

'আই ডোন্ট সি ইউ আর এ ট্রাভেলমেকার! সো...।'

'থ্যাংকস, জেনিফার। ক্যান আই বি ইউর ফ্রেন্ড ফ্রম টুডে?'

উচ্ছ্বাসভরা আদুরে গলায় জানতে চাইলো অলক। জেনিফার অ্যাপার্টম্যান্টের প্রবেশ পথের লক খুলতে গিয়ে বললো,

'ইফ ইউ ওয়ান্ট এ ফ্রেন্ড, আই ওয়ান্ট টু নো ইউ মোর, এ্যালেন।'

এ কথা শেষ করে জেনিফার ওর অ্যাপার্টমেন্টের লক খুলে ভেতরে ঢুকে দরজা ধরে দাঁড়াল। অলক জেনিফারের অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করল। অলক জেনিফারের এ কথাটিও টেনে নিয়ে যেতে পারত। ও কথা না বাড়িয়ে বলল,

'আই নো, আই হ্যাভ টু ওয়েট ফর ইওর ফ্রেন্ডশিপ!'

'মে বি।'

ছোট্ট করে জবাব দিয়েছিল জেনিফার। অলক জেনিফারের দিকে তাকাতে পারছিল না। ওর ভেতরে তুমুল উত্তেজনা ছিল। এ উত্তেজনার আনন্দ উপভোগের মধ্য দিয়ে অলক ওই রাত কাটিয়ে দিয়েছিল জেনিফারের লিভিংরুমে। মধ্য ম্যানহাটনে রকোফেলার প্লাজার সামনে দাঁড়িয়ে জেনিফারের সঙ্গে পরিচয়ের রাতের কথা ভাবছিল অলক। এর মধ্যে ওর সেল ফোন বেজে উঠল। ও ফোন অন করে বলল,

'হ্যালো...।'

'অলক, তুই কোথায়?'

ও প্রান্তে রাগী গলায় জানতে চাইলো রোমান। অলক জানে, রোমান ফোন করবে। কারণ, আজ ওর রান্না করার কথা। ও রান্না না করে চলে এসেছে। কী করে রান্না করবে ও? রান্না করলে জেনিফারের সঙ্গে লাঞ্চ করার সময় পেতো না। অলক জানে, ঘুম থেকে উঠে রোমান যখন খাবারের কিছু নেই, ও তখন রেগে যাবে। এমনি অবস্থায় রিয়াজ কিছু বলবে না। রোমান কিছুক্ষণ ঘ্যানর ঘ্যানর করবে। ও ঘরে খেয়েই কাজে যেতে চায়। রাতের শিফটে ট্যাক্সি চালায় ও। ভোরে বাসায় ফিরে মধ্য দুপুর-অব্দি ঘুমায়। ঘুম থেকে ওঠে গোসল করবে। এরপর দুপুরের খাবার খেয়ে ছুটবে ম্যানহাটনের উদ্দেশে। বেলা ৫ টায় পার্টনারের কাছ থেকে গাড়ি নেবে। ও সপ্তাহের ৬ দিন রাতে গাড়ি চালায়। রোমানের একটা বদ অভ্যাস হয়েছিল। প্রতি শনিবার রাতে সানিসাইডে একটা নাইট-ক্লাবে যেত। শনিবার রাতে ইয়েলোক্যাবিদের ঈর্ষণীয় আয় হয়। ওই আয়ের আকর্ষণ ফেলে ও সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত অব্দি ক্লাবে থাকত। অন্ধ প্রেম বলে কথা। এক পাকিস্তানি রূপসী নর্তকির প্রেমে পড়েছিল ও। রোমান ওই নর্তকিকে পাকিস্তানি বলতে চায় না। কারণ, মেয়েটির মা একজন বাংলাদেশী। পাকিস্তানি পিতা আর বাংলাদেশী মায়ের সন্তান হয়ে জীবীকার তাগিদে নাইটক্লাবে ড্যান্স করে মেয়েটি। মেয়েটি নাকি ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ও উর্দু ভাষায় কথা বলতে পারদর্শী। ক্লাবে একদিন চমকার বাংলা ভাষায় কথা বলেছিল রোমানের সঙ্গে। সেদিন থেকেই রোমান কুপোকাত। মেয়েটি ওকে ভালোবাসে কি-না, জানে না রোমান। জানার চেষ্টাও

করেনি। একতরফাভাবে ভালোবেসেছিল সে। কখনো মেয়েটিকে মনের কথা বলতেই পারেনি ও। শুধু মেয়েটির সামনে বসে বিয়ার গিলেছে। বিয়ারের নেশায় প্রেমিকাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করে গেছে কল্পনায়। এসব কথা রোমান অলককে বলেছে। বেশ কিছুদিন হলো রোমান ক্লাব ছেড়ে দিয়েছে। এ এখন সপ্তাহের ৬ দিন গাড়ি চালায়। একদিন ছুটি কাটায়। নিয়মিত রুটিনের মধ্যে ও জীবনযাপন করছে। ক্লাবে নর্তকির নাচ দেখা আর বিয়ার পান করার আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে অলক ও রিয়াজ। ওরা লক্ষ্য করেছে, রোমানের চিন্তার মধ্যে 'একদিন কাজ না করলে গাড়ির লিজমানি পকেট থেকে দিতে হবে'–এ কথাটি এখন সেঁটিয়ে থাকে। নিউইয়র্কের অধিকাংশ ইয়েলোক্যাবি এ চিন্তা করে।
অলক, রোমান ও রিয়াজ ৩ বন্ধু। ওরা জ্যাকসন হাইটসে এক বেডরুমের বাসা ভাড়া নিয়ে থাকে। একেকজন প্রত্যেকে সপ্তাহে একবার রান্না করে। এটা ওদের রুটিন কাজ। অলক এই রুটিন সবসময় মেনে চলতে পারে না। যেমন আজো পারেনি। 'রোমান, তুই একটা হারামজাদা!' মনে মনে বলল অলক। ফোনে বলল,
'দোস্ত, আমি একটা জরুরি কাজে ম্যানহাটান চলে এসেছি।'
'রান্নার দিন তোমার খালি জরুরি কাজ পড়ে যায়। শালা, ভণ্ড মালাউন!'
খিঁচিয়ে ওঠে রোমান। অলক রোমানের গালি গায়ে মাখে না। ও বলে,
'দোস্ত, ক্যাবি শালাদের মেজাজ সব সময় চটে থাকে কেন, বলত? গাড়ি চালাতে চালাতে শালাদের মানবিক বোধ ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। গালি ছাড়া কথা বলতে পারে না। কতবার তোকে বললাম, ট্যাক্সি চালানো ছাড়। তুই শালা কাঁচা ডলারের লোভ সামলাতে পারলি না!'
'মাঙ্গের পো, ক্যাবি গো সুযোগ পাইলেই গালি দাও? তুমি শালা, খচ্চর। রান্না করার দিন পালিয়ে যাও। এই যে এখন না খেয়ে কাজে যাব, তোমার হিউম্যান সেন্সটা কোথায়?'
রোমান রেগে গেলে অলকের সঙ্গে 'তুমি' সম্বোধন করে কথা বলে। সবসময় ওরা একে-অন্যকে 'তুই' সম্বোধন করে কথা বলে। অলক রোমানকে বিনয়ী গলায় বলল,
'দোস্ত, আমি জানি, তোর কষ্ট হবে। তুই একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে খেয়ে কাজে যা। আমি বিকেলে এসে রান্না করব। বিশ্বাস কর, একটা জরুরি কাজে আমাকে ম্যানহাটান আসতে হয়েছে। রাগ করিস না, বন্ধু!
'তোমার শালা জরুরি কাজ তো একটাই। নতুন কোনো বান্ধবী জুটাইছো, না?' রোমানের প্রশ্ন এক গাল হাসে অলক। ও বলে,
'দোস্ত, নতুন একটা ফাটাফাটি মাইয়া পাইছি। হলিউডের নায়িকার মতো। সাইজ কী শোনাবা?
'না, না। দরকার নাই। সাইজ লইয়া তুমি থাকো। শালা, বদমাইস!'
'তুমি শালা ভদ্রলোক? গাড়ির পার্টনারের বউয়ের সাথে লটরপটর করতাছো, এটা কি বদমাইসি না?'
'শালা, তোমার সন্দেহবাতিক রোগ আছে! আমি তোমার মতো লম্পট না। তুমি তো শালা আজ একটা, কাল আরেকটা ধইরা চলতাছো। শালা, তুমি নম্বর ওয়ান লম্পট!'
'হয়েছে বাবা! মানলাম আমি লম্পট। দোস্ত, এবার মনে হয় আমি লাস্ট স্টপিজে এসে গেছি। এবার থেমে যাব।'
'দেখা যাবে কোথায় থামো তুমি। মামা, আর কথা না। ফোন রাখছি।'
এ কথা বলে রোমান ফোন রেখে দেয়। রোমানের রাগ কমে গেলে ও বন্ধুদের 'মামা' বলে সম্বোধন করে। অলক বুঝলো রোমানের রাগ কমে গেছে। অলক আপন মনে হেসে সেলফোন প্যান্টের পকেটে রাখতেই জেনিফারকে দেখত পেলো। জেনিফার এগিয়ে আসছে ওর দিকে। জেনিফারের মুখে ভুবন ভোলানো হাসি। ও পরেছে কালো রঙের স্কার্ট এবং সাদা রঙের টপস। গলায় একটি সাদা কালোর কম্বিনেশনের স্কার্ফ ঝুলছে। চুলগুলো মাথার বাম পাশে ক্লিপ দিয়ে এমনভাবে আটকে রেখেছে যে, মনে হচ্ছে ওখানে দূর পাহাড়ের সৌন্দর্য বিধৃত হয়ে আছে। অলকের চোখ মুগ্ধতা পেখম ছড়িয়ে যায়। ও মনে মনে জেনিফারের উদ্দেশে বলল, 'জেনিফার, তোমার জন্য এই লম্পট অলক, সর্বশ্রেষ্ঠ সাধু ব্যক্তি হয়ে যেতে পারে!' এ কথা নিজের মনে উচ্চারিত হবার পর ওর মনে হতে লাগলো ওর ভেতরটা পাপমুক্ত হচ্ছে। ও কী মনে করে জেনিফারের দিকে দু'হাত তুলল। দু'হাত তোলার ভাষা হচ্ছে, 'আমার বাহুবন্ধনে আসো'। এর আগে কোনো মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে অলক এমন করেনি। ও ভেবেছিল জেনিফার ওর বাহুবন্ধনে না জড়িয়ে কাছে এসে চোখ কপালে তুলে বলবে, 'হোয়াট ইজ দিস?' কিন্তু জেনিফার তা করল না। ওকে অবাক করে দিয়ে জেনিফার ওর বাহুর বন্ধনে নিজেকে আলতো করে সঁপে দিলো। অলক ঘোরলাগা ভালোলাগায় মনে মনে বলে উঠলো,'জেনিফার, তুমি আমার ভালোবাসার লাস্ট স্টপেজ!'

তিন

প্রপার পেছনে জলপ্রপাত। রেসের ঘোড়ার মতো জলের ধারা লাফিয়ে নামছে উপত্যকার পাদদেশে। রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রপা। ওর মুখোমুখি রিয়াজ। ফলসের জলপবাহের নিরবচ্ছিন্ন শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঠিক শব্দ নয়, জলের গর্জন শুনতে পাচ্ছে! নায়াগ্রার জলের স্রোত, গর্জন ও ছন্দ ৩টাই আছে। গর্জন করে অবিরল জলের ধারা বয়ে চলছে সারাক্ষণ। ফলসের জল খরস্রোতে এসে উপত্যকার পাদদেশে ১ শ' ৬৭ ফুট নিচে লাফিয়ে নামছে। সমান্তরাল খাড়া এ উপত্যকায় প্রতি মিনিটে সর্বোচ্চ ৬ মিলিয়ন কিউবিক ফুট এবং এভারেজে ৪ মিলিয়ন কিউবিক ফুট জল নামছে। জল পড়ার সময় যে অভূতপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হচ্ছে, এর অপার সৌন্দর্যে অবিনশ্বর নান্দনিকতা ফুটে উঠছে। এ উপত্যকার সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিদিন শত শত বা হাজার হাজার লোক জলপ্রপাতের অপার সৌন্দর্যকে উপভোগ করছে। রিয়াজ ওয়েবে গিয়ে নায়াগ্রা ফলস সম্পর্কে সংক্ষেপে যা জেনেছে তা হলো, আটলান্টিক মহাসাগর থেকে এ ফলসের উৎপত্তি। নায়াগ্রা নদী কানাডার অন্টারিও প্রভিন্স থেকে শুরু হয়ে নিউইয়র্কের বাফেলো পর্যন্ত প্রবাহিত। এ ফলস যুক্তরাষ্ট্রের বাফেলোর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ১৭ মাইল বা ২৭ কিলোমিটার এবং কানাডার টরেন্টোর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ৭৫ মাইল বা ১২০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এ ফলসের মধ্যে গোট আইল্যান্ড ও লুনা আইল্যান্ড আছে। ধূসর জলধারার নির্মোহ সৌন্দর্যমণ্ডিত পতনের নাম নায়াগ্রা ফলস। এ জলধারা পতনে বরাবরই এক নান্দনিক চিত্রকল্প প্রতি মুহূর্তে ফুটে উঠছে। যে এ দৃশ্য দেখবে, তার চোখে-মুখে পেখম ছড়াবে অপার বিস্ময়। তাৎক্ষণিক বিস্ময়কে ছাপিয়ে যাবে গভীর আনন্দ। বিস্ময় ভরা আনন্দে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে নায়াগ্রার জলপ্রপাত দেখে দর্শনার্থীরা। রিয়াজের ধারাণা, নায়াগ্রার জলপ্রপাতের সামনে প্রথম যে দাঁড়াবে, সে গভীর আশ্চর্য বিহ্বলতায় ভাষামূক হয়ে যাবে। নায়াগ্রার জলপ্রপাত রিয়াজ যতবার দেখেছে ততবার ও বিস্ময় মিশ্রিত আনন্দে আপ্লুত হয়েছে। এর আগে ও একবার আগ্রায় তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে ও অপার্থিব মুগ্ধতায় এমন আপ্লুত হয়েছিল। নায়াগ্রার জলপ্রপাত ও তাজমহল সকলের কাছে বিস্ময়ের এক অনবদ্য নিদর্শন। নায়াগ্রা প্রাকৃতিক শৈলী আর তাজমহল মানুষের তৈরি অতুলনীয় শিল্পকর্ম। নায়াগার সৌন্দর্যের সামনে তাজমহলের কথা মনে পড়ল রিয়াজের। ও নিউইয়র্কে থাকে বলেই নায়াগ্রা ফলস দেখতে আরো ৫ বার এখানে এসেছে। যতবার ও এসেছে, ততবার মানুষের ভিড় দেখেছে এখানে। প্রপার জন্য ও এবার এখানে এসেছে। বোস্টন থেকে এ ফলস দেখতে প্রপা এসেছে ওর খালা-খালুর সঙ্গে। প্রপার অনুরোধে রিয়াজও চলে এসেছে। প্রপা রিয়াজকে অনুরোধ না করলেও ও নায়াগ্রায় চলে আসত। প্রপা কোথাও যাচ্ছে এমন খবর পেলে রিয়াজ কি সেখানে না গিয়ে পারে? প্রপা হচ্ছে ওর জীবনের সবকিছু, বেঁচে থাকার অবলম্বন। রিয়াজের মনে হয়, ও যখন নিঃশ্বাস নেয় তখন প্রপার নাম উচ্চারিত হয়। আবার যখন নিঃশ্বাস ছাড়ে, তখনো প্রপার নাম উচ্চারিত হয়। এটা ভাবলে ও নিজেই আশ্চর্য হয়। রিয়াজ প্রপার দিকে চেয়ে থেকে এ সব কথা তন্ময় হয়ে ভাবছিল। প্রপা অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিল যে রিয়াজ অন্যমনস্ক হয়ে আছে। ওর অন্যমনস্কতা ভেঙে দিতে প্রপা মিষ্টি কণ্ঠে প্রশ্ন করল,

'অমন হা করে কী দেখছো?'

প্রপার প্রশ্নে তন্ময়তা ভাঙে রিয়াজের। ও আবেশিত কণ্ঠে তাৎক্ষণিক জবাবে বলল,

'দেখছি তোমাকে!'

এমন জবাব প্রপা অনেকবার পেয়েছে। এ ধরনের কথা রিয়াজ প্রায় বলে। এমন কি, প্রপাকে রিয়াজ যখন দেখেওনি তখনো সে এ কথা বলেছে। ওদের পরিচয় ইন্টারনেটে ফেইসবুক থেকে। ফেইসবুকে চ্যাটিং করত ওরা। ফেইসবুক বন্ধুত্ব থেকে প্রেম। চ্যাটিং করার সময় রিয়াজ বলতো যে, ওকে দেখছে। রিয়াজ এভাবে নিজের মুগ্ধতার কথা জানান দিতো। রিয়াজের এই নিটোল মুগ্ধতা প্রকাশ প্রপার ভালো লাগে। ও নিজের ভালোলাগার আবেগ চাপা রেখে বলল,

'আমার মধ্যে অমন হা করে দেখার কী আছে?'

এমন প্রশ্নও প্রপা অনেকবার করেছে। রিয়াজ এ প্রশ্নটা পছন্দ করে। প্রপা এ প্রশ্ন করলেই ও কাব্যময় জবাব দেয়ার চেষ্টা করে। ও এখন বলল,

'তোমার মধ্যে আছে সমুদ্রের উচ্ছ্বাস, নদীর লাবণ্য, অরণ্যের রহস্য, পাহাড়ের মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকার অহঙ্কার, দামাল বাতাসের চপলতা…।

'হয়েছো হয়েছো থামো।'

'কোনো? আমেরিকা হচ্ছে কথা বলার দেশ। থামব কেন?'

'তাই বলে কথার নামে মিথ্যা কথার ফুলঝুড়ি?'

‘মিথ্যা বলছ কাকে? তাহলে তো সব কবিতাই মিথ্যার ফুলঝুরি।’
‘তোমার কথার সঙ্গে কবিতার তুলনা করছ?’
প্রপার প্রশ্ন রিয়াজ পাল্টা প্রশ্ন করল,
‘আমি মিথ্যা কথা বলছি!’
‘নয়তো কি? তুমি ফ্ল্যাট করছ। ডাহা মিথ্যার ফানুস উড়াচ্ছ। এখানে শিল্প নেই। আর কবিতা হচ্ছে শিল্প।’
‘কল্পনার রঙ মিশ্রিত কথাই কবিতার শিল্পময়তায় প্রকাশ পায়, প্রপা! আমিও যা বলছি কল্পনার রঙে মিশ্রিত কথামালার এক পশলা আবেগ। এখানে শিল্পমানের বিচারটা কি জরুরি?’
‘জরুরি বা জরুরি কি-না, এটা তর্কের বিষয় নয়। আমি বলতে চাচ্ছি, কবিতা হচ্ছে শিল্প, কথার ফানুস হচ্ছে সাধারণ মানের কিছু।’
প্রপার কথার জবাব দিতে একটু সময় নিলো রিয়াজ। প্রপার কথার একটা যুঁতসই জবাব খুঁজতে হবে। রিয়াজের নীরবতা দেখে প্রপা মুখ টিপে হাসতে লাগল। প্রপার হাসিকে প্রশ্রয় দিয়ে রিয়াজ বলল,
‘সবাই চাইলেও সুন্দর করে এবং সুন্দর কিছু কথা বলতে পারে না, জানো?’
‘জানি।’
‘কেউ কেউ কথা বলতে গিয়ে কাব্যময়তা ফুটিয়ে তুলতে পারে, এটাও অসাধারণ কিছু। আসাধারণ মানে এক ধরনের শিল্প বা এরও এক ধরনের শিল্পমান আছে। এ কথা মানো?’
এ কথায় প্রপাও একটু ভাবল। এরপর ও বলল,
‘আসলে আমি বলতে চাইছি, যা বলবে সত্যের সাহসী উচ্চারণে বলবে। অকারণে গাদা গাদা মিথ্যার প্রলেপ দিয়ে কথা কথামালার প্রয়োজন নেই।’
‘এখানে আমার দ্বিমত আছে। যে মিথ্যা কাউকে ঠকায় না, প্রবঞ্চিত করে না বা কোনোভাবেই কারো ক্ষতির কারণ হয় না। বরং তাৎক্ষণিকভাবে একজনকে আবেশিত করতে পারে, এ ধরনের কথার প্রশ্রয় পাওয়া উচিত।’
‘মিথ্যা, মিথ্যাই। একে প্রশ্রয় দেয়া যায় না। তাহলে সত্যেরও অবমূল্যায়ন করা হয়। ‘মিথ্যা কথা’ রোমান্টিক আবেগের আড়ালে চোরা কাঁটার মতো বিঁধে থাকে। এই কাঁটা মিলিয়ে যেতেও পারে, আবার বিষফোঁড়া হয়ে দেখা দিতে পারে!’
প্রপার কথাটা ভালো লাগল রিয়াজের। এ কথারও একটা জবাব ও দিতে পারে। কিন্তু প্রপাকে ও একটা পর্যায়ে এসে হারিয়ে দিতে চায় না। বরং জিতিয়ে দিতে চায়। নীরবে এবং একান্ত মনে হারটা মেনে নেয় ও। কিন্তু প্রপাকে বুঝতে দেয় না। ও তর্কটা থামিয়ে দিতে বলল,
‘তোমার কথায় এখানে এসে হেরে গেলাম।’
‘তুমি সব সময় আমার কছে হেরে যাবে। কখনোই জিততে পারবে না।’
দৃঢ়কণ্ঠে বলল প্রপা। রিয়াজ মৃদু হাসল। ও প্রশ্ন করল,
‘তাই নাকি? কেন?’
‘পরাজয়টা তোমার ভবিতব্য। জয়টা আমার প্রাপ্য, তাই.!’
‘এটা কি অনিবার্য? নাকি তোমার কল্পনা?’
‘এটা তোমার সম্পর্কে আমার মূল্যায়ন। বলতে পারো পর্যালোচনার পর বাস্তবতার কমেন্ট।’
‘তোমার কথার মধ্যে আমি অভিশপ্ত জীবনের গন্ধ পাচ্ছি!’
‘না, না। অভিশপ্ত জীবন তোমার হবে কেন? পরাজয় মানেই কি হেরে যাওয়া?’
‘তা নয়?’
‘না। পরাজিত হলেই সব সময় হেরে যাওয়া নয়। কখনো কখনো জিতে যাওয়াও।’
‘যেমন?’
‘যেমন ধরো, দেবদাস। সে পার্বতীকে জীবন-সঙ্গীনি হিসেবে পায়নি। এখানে সে জীবনের চাওয়া-পাওয়ার হিসেবে পরাজিত হয়েছে। কিন্তু ভালোবাসার বিচারে সে কী হেরে গেছে? ভালোবাসার মহিমায় তার হয়েছে আকাশচুম্বি জয়।’
‘বলো কি, পার্বতীকে জীবন-সঙ্গীনি হিসেবে না পাওয়াকে জয় বলছ!’
বিস্ময় প্রকাশ করে রিয়াজ। প্রপা বলে,
‘দেবদাসের পরাজয় বা বিরহ বিধূর প্রেম কালের কণ্ঠে অমর প্রেমের বাণী হয়ে ধ্বণিত হচ্ছে। এমন প্রাপ্তিকে তুমি মর্যাদার সঙ্গে বিবেচনা করবে না? জয় বলবে না?’

প্রপার কথায় রিয়াজ দু'কাঁধ উঁচিয়ে তা ছেড়ে দিয়ে মুখে হতাশা প্রকাশ করে বলল,
'আমি কিন্তু পার্বতীকে না পাওয়ার মধ্যে দেবদাসের প্রাপ্তি কিছু দেখি না। জয়ও দেখি না।'
'কেন?'
জানতে চাইলো প্রপা। রিয়াজ বলল,
'বিরহ নিয়ে অভিমানী দেবদাসের অহঙ্কার করারও কিছু নেই। তার আছে কেবল পরাজয়ের গ্লানি।'
'তোমার বিচারে দেবদাস কি?'
'আমার বিচারে, দেবদাস হচ্ছে স্বেচ্ছাচারী ও আত্ম-অভিমানী এক প্রেমিক। পার্বতীকে সে হারায়নি। সে পার্বতীকে পাওয়ার চেষ্টাও করেনি। পার্বতীকে সে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। সে পার্বতীর প্রেমকে অবমূল্যায়ন করে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে প্রথমে সে ভালোবাসাকেই অপমান করেছে।'
'তাই?'
জানতে চাইলো প্রপা। রিয়াজ বলল,
'দেবদাস প্রকৃত অর্থে ভীতু এবং কাপুরুষ। পার্বতীকে সে কখনো পাবারও জোরালো চেষ্টা করেনি। কিন্তু পার্বতীকে ভালোবেসেছিল। সেটাই সে বুঝতে পেরেছে অনেক পর। বিরহের মধ্য দিয়ে নিজের ভেতর প্রেম ও অভিমানকে একাকার করে দেবদাসের আত্মদহন একসময় বেড়ে যায়। পার্বতীর প্রতি দুর্বার প্রেম তার মাদকাসক্তি বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু তার এই আত্মক্ষরণ পার্বতীকে কী দিয়েছে? পার্বতীর বাড়ির সামনে গিয়ে অসহায় মৃত্যুবরণ করে দেবদাস হয়তো ভালোবাসাকে মহিমামণ্ডিত করেছে; কিন্তু এমন পরাজয়ের মহত্ব কী আমি বুঝি না। তবে প্রেমিক হিসেবে তার একটা মূল্যায়ন হতে পারে। '
'তোমার সঙ্গে তর্ক করে আমি কি পারব?'
'কেন? আমি তো তোমার কাছে বরাবরই হেরে যাই!'
এ কথায় হাসলো প্রপা। রিয়াজের এ কথার জবাব না দিয়ে দেবদাস প্রসঙ্গে প্রপা বলল,
'আমি বলতে চেয়েছি, দেবদাস যে পার্বতীকে পায়নি, তাই বলে কি ভালোবাসার বিচারে সে হেরে গেছে? প্রেমিক হিসেবে একটা প্রাপ্তি তো আছেই, তাই না? এই যে দেবদাসকে নিয়ে কথা বলছি, এটাই তার জয়। বুজলে?'
এর জবাব দিতে কয়েক সেকেন্ড ভাবল রিয়াজ। এরপর বলল,
'বুজেছি। কিন্তু আমি দেবদাস হতে চাই না। আমি তোমাকে না পেয়ে মহিমামণ্ডিত প্রেমিকও হতে চাই না।'
রিয়াজের কথায় খিলখিল করে হাসতে লাগলো প্রপা। ও এমনভাবে হাসছে মনে হচ্ছে, গোলাপ কুড়ির পাপড়ি ফুটছে। রিয়াজ মুগ্ধ চোখে প্রপার দিকে চেয়ে রইল। হাসি থামার পর প্রপা বলল,
'আচ্ছা, তুমি এমন কেনো বলো তো? কোথায় দেবদাস-পার্বতী আর সত্য-মিথ্যা নিয়ে কথা বলছি! আর তুমি নিজেকে দেবদাসের ভাগ্য বিপর্যয়ের সঙ্গে তুলনা করছ!'
'এই তো একটা জায়গায় এসেছ। ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা বলেছ। ভাগ্য বলে ধরে নিলে তো দেবদাস বা পার্বতী কারোর দোষ নেই। যা অনিবার্য, তা-ই তো ভাগ্য! এটা মেনে নিলে দেবদাস তো ভাগ্য নির্দেশিত অনিবার্য ঘটনার বরপুত্র মাত্র, তাই না?'
'হ্যাঁ। এখন কী বলবে?'
'এখন বলব, ভাগ্য বলো, দৈব বলো, অনিবার্য ঘটনা বলো বা আর যা কিছু বলো, আমি তোমাকেই চাই। সুমনের গানের কথায় প্রথমত আমি তোমাকে চাই, দ্বিতীয়ত আমি তোমাকে চাই, তৃতীয়ত আমি তোমাকে চাই, শেষ পর্যন্ত তোমাকে চাই। তোমাকে না পেয়ে হেরে দেবদাস হবার মধ্যে কোনো বীরত্ব নেই, কোনো মহত্ব নেই, বেঁচে থাকারও কোনো অর্থ নেই। কিছুই নেই।'
হাসির দমকে দমকে কাঁপছে প্রপা। প্রাণবন্ত হাসি। প্রপা এমন প্রাণ খুলে হাসছে যে, মনে হচ্ছে নায়াগ্রার জলের উচ্ছ্বলতার চেয়েও উচ্ছ্বল। প্রপার এ হাসি রিয়াজকে বরাবরই মুগ্ধ করে দেয়।
নায়াগ্রা ফলসের আকাশ স্বচ্ছ নীল। আকাশে ছোপ ছোপ সাদা মেঘ। মধ্যাকাশ থেকে সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে। রোদের কিরণে তেমন তাপ নেই। মৃদৃমন্দ বাতাসের সঙ্গে যে তাপ অনুভূত হচ্ছে, এতে মনে হচ্ছে সূর্যকরণেরও মধুর আমেজ আছে। অবিরল সৌন্দর্যের নৈস্বার্গিক পরিবেশে প্রপার হাসির মুদ্রার সামনে রিয়াজ কেমন আবিষ্টতায় মগ্ন। ওর মনে হচ্ছিল নায়াগ্রার জলপ্রপাতের মতো ওর বুকের ভেতরেও আনন্দের একটা ফল্গুধারা নেমে যাচ্ছে। গভীর আনন্দ রিয়াজকে ভাবুলতায় আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। ও ভাবুলতায় ডুবে যাচ্ছিল, জয়নালের কণ্ঠে ওর ভাবুলতা ভেঙে যায়।

‘রিয়াজ সাহেব, এটা ভাবী নাকি?’
প্রপার পাশে দাঁড়িয়েছে জয়নাল। প্রপার হাসি থেমে গেছে। রিয়াজ দেখলো জয়নাল একা, তার সঙ্গে শায়লা নেই। ও হচকিত কণ্ঠে বলল,
‘না, না। আমরা এখনো বিয়ে করিনি। আপনি এখানে?’
রিয়াজের কথায় দাঁত কেলিয়ে হাসলো জয়নাল। প্রপা খানিকটা বিব্রত। জয়নাল বলল,
‘চলে যাচ্ছি, আপনারা আজ এখানে থাকবেন? শুনেছি রাতে এই ফল্‌স দেখার অন্যরকম মজা আছে?’
রিয়াজ মুখে হাসি টেনে বলল,
‘ঠিক জানি না। আমিও শুনেছি যে, রাতের ফলসের আলাদা একটা সৌন্দর্য আছে। তবে কখনো দেখিনি। আজকেও দেখা হবে না।’
জয়নাল বলল,
‘আমরা শহরের দিকে যাচ্ছি। চাইলে আপনারা আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন। যাবেন নাকি? গাড়িতে জায়গা আছে।’
জয়নালের এই অফারটা যে তার নিজের নয়, তা বুঝতে পারছে রিয়াজ। নিশ্চয়, শায়লা তাকে পাঠিয়েছে। রিয়াজ আশপাশে শায়লাকে দেখতে পেলো না। দূরে কোথাও আছে হয়তো, ভাবলো ও। বলল,
‘ধন্যবাদ, জয়নাল সাহেব। আসলে আমি ফিরব বাসে। প্রপা যাবে ওর খালা-খালুর সঙ্গে গাড়িতে।’
‘ওহ্! উনি কি নিউইয়র্কে থাকেন?’
প্রপাকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইলো জয়নাল। এ ধরনের অযাচিত প্রশ্ন বিরক্তিকর। কিন্তু জয়নালের মতো লোকেরা তা বুঝে না না। রিয়াজ হাসিমুখে বলল,
‘ও থাকে বোস্টনে।’
‘ও আচ্ছা। তাহলে আমি যাই?’
‘আচ্ছা। আসুন।’
জয়নাল মুখে হাসি ধরে রেখে চলে গেলো। রিয়াজ তার চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইল। ও দেখার চেষ্টা করছিল শায়লা কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রপার কথায় দৃষ্টি সরিয়ে আনে ও।
‘লোকটি কে?’
প্রপার প্রশ্নে খানিকটা বিরক্তি। রিয়াজ বলল,
‘লোকটির নাম জয়নাল। নিউইয়র্ক শহরের ব্রুকলিনে থাকে। গ্রোসারির দোকানের মালিক।’
‘তুমি চিনো কী করে?’
‘আজ সকালেই পরিচয় হলো। তার স্ত্রী শায়লা আমার পূর্ব পরিচিত।’
‘তাই নাকি?’
‘হুম্। কিন্তু আমি আজ তাকে দেখে প্রথমে চিনতে পারিনি। অথচ শায়লা আমাকে চিনতে পেরেছে। অনেক আগে ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।’
‘কিন্তু শায়লাকে তো দেখলাম না!’
প্রপার কণ্ঠে বিস্ময়। রিয়াজ এর জবাবে কী বলবে ভেবে পেলো না। কিছু না বলাটাও প্রশ্নটা কৌতুহল ছড়াবে। রিয়াজ বলল,
‘হয়তো আশপাশেই ছিল। তোমার সামনে আসেনি। তাতে কি?’
‘না, তেমন কিছু নয়। প্রশ্নটা এমনিতেই মনে এলো। বাদ দাও। জয়নাল সাহেব কেমন গেঁয়ো, তাই না?’
প্রপার কথায় হাসলো রিয়াজ। এই হাসির মধ্য দিয়ে প্রপার কথার মৌন সমর্থন জানালো। রিয়াজ কিছু বলতে যাচ্ছিল। প্রপা বলল,
‘আমার আর ভালো লাগছে না, রিয়াজ। চলো হোটেলে যাই। খালা-খালু হয়তো হোটেলে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।’
প্রপার কথায় রিয়াজের মনে যে ছন্দ ছিল, এর পতন ঘটল। প্রপার দিকে তাকালো ও। প্রপার চোখে-মুখে এক ধরনের অন্যমনস্কতা নেমে আসছে। এই অন্যমনস্কতা বিষণ্নতার জন্ম দেয়। রিয়াজ প্রপাকে অন্যমনস্ক দেখতে চায় না, বিষণ্নতা একেবারেই পছন্দ করে না। ও প্রপাকে বলল,
‘আর কিছুক্ষণ বসবে? ভালোই তো লাগছিল।’
প্রপা বলল,

'না, চলো। আমাকে হোটেলে পৌঁছে দাও। তোমাকেও তো বাড়ি ফিরতে হবে, তাই না?'
'হুম। তোমরা যাবার পর আমি বাস ধরব। রাতের বাস ধরলেও হবে।'
রিয়াজের কথায় ঠোঁট উল্টিয়ে প্রপা বলল,
'তুমি ড্রাইভিং লাইসেন্স নিচ্ছ না কেন? বাসে-ট্রেনে চড়লে তাহলে আমেরিকায় থাকার মজা কি?'
প্রপার কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু রিয়াজ ড্রাইভিং একেবারেই পছন্দ করে না। এ প্রশ্নটা এলেই ও চুপসে যায়। প্রপা জানে এ প্রশ্নে ও বিব্রত হয়, তবু এ প্রশ্নটা ও সুযোগ পেলেই করে। রিয়াজের মনের কথাটা যেন প্রপা পড়ে ফেলল। ও আদুরে গলায় বলল,
'মন খারাপ করে দিলাম?'
'না, না। মন খারাপ হবে কেন?'
'আমি তোমাকে চিনি না? তোমার মন খারাপ হলেই আমি বুঝতে পারি।'
'না, না, সত্যি বলছি। মন খারাপ হয়নি।'
রিয়াজ লাজুক ভাব প্রকাশ করে। প্রপা বলল,
'ঠিক আছে চলো। আমাকে হোটেলে পৌঁছে দাও।'
এ কথা বলে প্রপা রিয়াজের হাত ধরলো। রিয়াজের মনে যে বিষণ্ণতা কুয়াশার মতো জমে যাচ্ছিল, তা মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল। ও প্রপার বাম হাত ওর ডান হাতের মুঠোবন্দি করে ফেলল। এরপর দু'জনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। নায়াগ্রার জলতরঙ্গের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রিয়াজের মনোজগতে একটা রিদম বাজতে লাগলো। ওর ভেতরে শুরু হলো মিহিন তোলপাড়। প্রপাকে স্পর্শ করলেই এই তোলপাড়টা ওর হয়। এই তোলপাড়ের কী নাম হতে পারে? প্রশ্নটা ওর মনে হেমন্তের আকাশে সাদা মেঘের ভেলার মতো ভেসে উঠল।

চার.

এলিনার সঙ্গে কখনো দেখা হবে ভাবেনি রোমান। অনেকটা আকস্মিক ও কাকতালীয়ভাবে এলিনার সঙ্গে ওর দেখা হয়ে গেলো। প্রায় এক বছর হলো রোমান টিউলিপ নাইটক্লাবে যায় না। হঠাৎ করে টিউলিপ নাইটক্লাবে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে ও। আগে এলিনার জন্যই ও ক্লাবে যেত। সপ্তাহের শনি ও রোববার নাইটক্লাবে যাওয়া ছিল ওর রুটিন কাজ। এলিনা ওই দু'দিন ক্লাবে ডান্স করত। এলিনার উদ্দাম নাচ না দেখলে ওর মনে জমে থাকা তৃষ্ণা মিটত না। এলিনার ডান্স দেখত ও ছিল বেপরোয়া। শনি ও রোববার ছাড়া বাকি ৫ দিন তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করত। এলিনা কেন প্রতিদিন ক্লাবে ডান্স করে না, এ নিয়ে ওর খুব আক্ষেপ ছিল। এলিনা সোম থেকে শুক্রবার কলেজে যেত। কলেজের টিউশন যোগাতে ও নাইটক্লাবে ডান্স করত। এলিনার সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে এ কথা জানতে পারে রোমান। এরপর এলিনার প্রতি দুর্বলতা জন্ম নেয় ওর। কলেজ ছাত্রী সেমিস্টারের অর্থ যোগাতে নাইটক্লাবে ড্যান্স করছে, নিউইয়র্ক শহরে এমন ঘটনা নতুন নয়। বিভিন্ন কলেজের ছাত্রী পার্টটাইম চাকরি হিসেবে নাইটক্লাবে নাচে। এলিনাও সে রকম একজন কলেজ স্টুডেন্ট কাম নর্তকী। এলিনা অসম্ভব সুন্দরী! এলিনাকে সুন্দরী বললে যথার্থ মনে হয়না, ওকে অপ্সরী বললে মানানসই। এলিনার দিকে তাকালে রোমান কখনো ওর দৃষ্টি সরিয়ে আনতে পারত না। নাচতেও পারে চমৎকার। নাচলে যেন ঝড় ওঠে। এলিনার বাবা পাকিস্তানি আর মা বাংলাদেশী। এ দেশে ওর বাবা-মায়ের পরিচয় এবং বিয়ে হয়েছে। রোমান জানে, এলিনার নাচ দেখার জন্য ওর মতো আরো অনেকে শনি ও রোববার টিউলিপ নাইটক্লাবে ভিড় জমায়। রোমান ওই ক্লাবে গ্লাসের পর গ্লাস বিয়ার পান করলেও ওর মনে হতো এলিনার শারীরিক সৌন্দর্য দেখে বিয়ার বা মদ পান না করেও মাতাল হওয়া যায়। ক্লাবে ওর নাচ বাড়তি পাওনা। ওর চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য শুধু মুগ্ধ করে না, সম্মোহিতও করে। রোমান বরাবরই এলিনার রূপে ছিল সম্মোহিত, নৃত্যের জাদুতে বিহ্বল। এলিনাকে ওর বিহ্বলতার কথা ও কখনো বলতে পারেনি। বলার সুযোগও পায়নি। তবে অনেকদিনের তপস্যায় ওর সঙ্গে এক রকম বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। বন্ধুত্বের সম্পর্ক নতুন এক মেরুকরণের দিকে টেনে নিতে চেয়েছিল রোমান। কিন্তু একদিন ধূলিসাৎ হয়ে যায় রোমানের স্বপ্ন। টিউলিপ নাইটক্লাবে মধ্যরাত পর্যন্ত থাকত রোমান। মধ্যরাতে বাড়ি ফিরত এলিনা। এ সুযোগটা নিত ও। ও এলিনাকে লিফট অফার করতো। অনেকদিন পর্যন্ত এলিনা ওকে এড়িয়েছিল। একপর্যায়ে এসে লিফট নেয় ও। এরপর মাঝে মাঝে নোমান এলিনাকে বাড়ি পৌঁছে দিত। এটাই ওর জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। এলিনার যে আরো আশিক-দিওয়ানা থাকতে পারে, এটা ভাবেনি রোমান। একদিন রাতে এলিনার বাড়ির সামনে ওর এক আশিক ৩ বন্ধুকে নিয়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ৪

জনের বেধড়ক পিটুনিতে রোমান কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। ওদের আচানক আক্রমণে প্রথমে কিছু বুঝে উঠতে পারেনি ও। ৩ যুবকের বেপরোয়া ঘুষিতে ওর নাকমুখ দিয়ে রক্তের স্রোত নেমে এলো। ঘুষি, লাথি, চড় আর গালাগাল মধ্যরাতের নীরবতাকে ভেঙে দিয়েছিল। রোমানকে ওরা মেরেই ফেলত কি না, কে জানে। রাস্তা দিয়ে পুলিশের গাড়ি যাচ্ছিল, এতেই প্রাণে রক্ষা পেয়েছিল ও। ওকে প্রহার করার অভিযোগে পুলিশ ৪ পাকিস্তানি যুবককে গ্রেফতার করেছিল। ওই যুবকরা পুলিশের কাছে ওর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে বলেছিল, রোমান এলিনার ব্যাগ ছিনতাই করার চেষ্টা করছিল। ওরা এসে উত্তেজিত হয়ে রোমানকে মেরেছে। ওদের মিথ্যা অভিযোগে রোমানকেও আইনের মারপ্যাঁচ পড়তে হয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, আদালতে এসে এলিনা ওই ৪ যুবকের মিথ্যা কথার সপক্ষে সাক্ষী দিয়েছিল। এলিনা পাকিস্তানি পিতার সন্তান বলেই হয়তো পিতার দেশের নাগরিকের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়নি। এ ঘটনায় রোমান এতটাই বিস্মিত ও ব্যথিত হয় যে, ওইদিন থেকে আর কোনোদিন নাইটক্লাবে যায়নি। আজ এক বছর পর এলিনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ম্যানহাটনে ফেডারেল প্লাজার সামনে। রোমান যাচ্ছিলো ফেডারেল প্লাজার বিপরীতমুখী ভবনে অ্যাটার্নি মীর মিজানুর রহমানের চেম্বারে। ফেডারেল প্লাজা হচ্ছে অভিবাসী নাগরিকদের ভাগ্য নির্ধারণের স্থান। নিউইয়র্কে বসবাসরত অভিবাসীদের আইনি কার্যকলাপ পরিচালিত হয় এখানে। ফেডারেল ভবনে রয়েছে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য নির্ধারণের আদালত। একসময় এ ফেডারেল প্লাজার সামনে অভিবাসীদের দীর্ঘ লাইন দেখা যেত। এখন আর সেই ভিড় দেখা যায় না। এ ভবনকে ঘিরে অনেকের দীর্ঘশ্বাস-কান্না, আবার অনেকের গভীর আনন্দ জড়িয়ে রয়েছে। রোমান আজ এসেছে ওর এক বন্ধু ইকবালকে সাহায্য করতে। ইকবালকে কাল রাতে হোমল্যান্ড সিকিউরিটির কর্মকর্তারা গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। ইকবাল এখন রয়েছে নিউজার্সির এলিজাবেদের ডিটেনশন সেন্টারে। জামিনে মুক্ত করতে না পারলে ওকে পাঠিয়ে দেয়া হবে এ দেশ থেকে। ওর জামিনের জন্য ও যাচ্ছিল অ্যাটার্নি মীর মিজানের কাছে। অ্যাটার্নি মীর মিজানুর রহমান 'ইমিগ্রেশন অ্যাটার্নি' হিসেবে খুব সুনাম অর্জন করেছেন। বাংলাদেশী কমিউনিটিতে তিনি ব্যাপকভাবে পরিচিত। বন্ধুকে কারাগার থেকে বের করতে ও ছুটে এসেছে অ্যাটার্নির কাছে। অ্যাটার্নির চেম্বারের দিকে যাবার সময় রাস্তার ফুটপাতে মুখোমুখি দেখা হলো এলিনার সঙ্গে। ওকে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। এলিনা রোমানকে দেখে একরকম চিৎকার করে উঠল,

'রো-মা-ন! হাউ আর ইউ?'

এলিনার উচ্ছ্বাস দেখে অবাক হলো ও। যে মেয়েটি ওর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছে, সে আবার তাকে দেখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে। রোমানের মুখে কথা ফুটল না। এলিনার সামনে দাঁড়িয়ে ও মৃদু হাসলো। এ ধরনের হাসির অনেক রকম অর্থ হতে পারে। এলিনা রোমানের দু'হাতের কবজি নিজের দু'হাতের মুঠোয় বন্দি করে নিলো। রোমান অনুভব করল এলিনার শরীর কাঁপছে। ও এলিনার চোখে চোখ রাখতেই এলিনা কেমন অভিমানের গলায় বলল,

'হোয়াই ইউ ডিড নট কাম মাই ক্লাব, নোমান? হোয়াই?'

এর জবাবে রোমান কী বলবে? ও কিছু বলতে চায় না। এলিনা ওর হাত ধরে আছে। এলিনা কখনো এভাবে ওর হাত ধরেনি। রোমানের ভেতরে একটা তোলপাড় হচ্ছে। এলিনা এবার বাংলায় বলল,

'আমি জানি, তুমি আমার ওপর রেগে আছো। রাগ করাটা খুব স্বাভাবিক।

কিন্তু আমি ওই ঘটনার পর থেকে ভীষণ, ভীষণ অনুতাপে পুড়ছি। ভীষণ, ভীষণ কষ্ট নিয়ে আছি। বিশ্বাস করো, রোমান!'

রোমানের এবার মনে হলো ওর কিছু বলা দরকার। ও বলল,

'এলিনা, একটা সময় ছিল, তোমার কথা ভাবলেই আমি কেমন উত্তেজনা বোধ করতাম। আনন্দে শিহরিত হতাম। আর সেদিনের ঘটনার পর থেকে আমি ভয়ে শিউরে উঠি। আমার ভেতরটা ভেঙে যায়।'

রোমানের কথায় অপরাধী চোখের দৃষ্টি মেলে এলিনা বলল,

'আমি জানি, আমার কাজটি ঠিক হয়নি। কিন্তু আমি আদালতে মিথ্যা বলতে বাধ্য হয়েছিলাম।'

'রিয়েলি! হাউ ফানি!'

কটাক্ষ করল রোমান। ওর ভেতরে রাগ টের পাচ্ছে ও। এলিনা ওর হাত ধরেই আছে, যেন ছেড়ে দিলে রোমান পালিয়ে যাবে। এলিনা বলল,

'ট্রাস্ট মি, রোমান। বিলিভ মি, প্লিজ!'

এতদিন পর এলিনা ওকে বিশ্বাস করতে বলছে। এলিনাকে লিফট দেয়ার জন্য ৪ জন ওকে পেটালো, আর এলিনা আদালতে গিয়ে ওই যুবকগুলোর পক্ষে সাক্ষী দিয়েছে। এমন চাক্ষুষ প্রহসনের পর এলিনা ওকে ট্রাস্ট করতে বলছে। মনে মনে আক্ষেপ করলেও এলিনার মুখের দিকে তাকিয়ে সংযতকণ্ঠে বলল,

‘বলো, আর কী বলতে চাও। বলো, আমি শুনছি।’
‘সেদিন আমি তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যা না বললে আমার অনেক ক্ষতি হতো, রোমান। আমি নিজের স্বার্থের জন্য তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছি। আমি এর জন্য তোমার কাছে করজোরে ক্ষমা চাচ্ছি।’
এলিনা নিজের দোষ স্বীকার করে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাওয়ায় রোমানের মনে চেপে থাকা কেমন একটা গুমোট অভিমান ডানা ঝাপটালো যেন। জমাট বরফ গলতে শুরু করলো। রোমান অভিমানভেজা কণ্ঠে বলল,
‘আমার ক্ষমা দিয়ে তোমার কী হবে? ক্ষমা করলেই কি, না করলেই কী?’
রোমানের অনুযোগে এলিনার চোখে যেন মেঘ জমতে শুরু করল। এলিনার চোখ দুটি চলচল করে উঠল। ‘ও কি কেঁদে ফেলবে?’ ভাবলো রোমান। এলিনা ধরা গলায় বলল,
‘রোমান, অনেকদিন থেকে অনুশোচনার কষ্ট তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে আমাকে। তুমি ক্ষমা না করলে এই কষ্ট থেকে রেহাই পাব না। একজন মুসলমান হিসেবেও জান্নাত পাব না।’
এলিনার কথা শুনে হেসে ফেলল রোমান। এলিনা ওর মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। রোমান হাসিমুখে বলল,
‘নিজেকে একজন মুসলিম নারী বলে দাবি করছ? অথচ তুমি নাইটক্লাবে ড্যান্স করো, আবার যে তোমাকে বিপদে সহযোগিতা করে, তার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দাও। এরপরও নিজেকে মুসলমান দাবি করছ?’
এ কথায় এলিনার মুখ লজ্জায় অবনত হয়ে এলো। লাজুক মুখে ও বলল,
‘আমি জানি, সেদিন আমি মিথ্যা কথা বলে পাপ করেছি। তোমাকে কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু নাইটক্লাবে ড্যান্স করলেই যে নষ্ট হয়ে গেছি, তা ভাবছো কেনো?’
‘তাই? নাইটক্লাবে মাতাল-উন্মত্ত পুরুষদের সামনে নাচ করাটা বুঝি পাপ নয়?’
বিদ্রুপ করেই কথাটা বলল রোমান। এলিনা স্মিত হেসে বলল,
‘নাচটা আমার পেশা। অর্থের জন্য ক্লাবে ড্যান্স করেছি। এতে কতটা পাপ করেছি জানি না। আরো জানি না, কতটা পাপ করলে মুসলমান দাবি করা যায় না। তুমি কি জানো?’
প্রশ্নটার খোঁচা লাগল যেন। রোমান এর জবাবে কী বলবে ভেবে পেল না। ও জানে না, কতটা পাপ করলে মুসলমান থাকা যায় না। ও আমতা আমতা করে বলল,
‘তুমি কী বলতে চাও, বলো। তোমার মুসলমানিত্ব নিয়ে তর্ক করতে চাই না।’
এলিনা রোমানের চোখে চোখ রেখে মিষ্টি করে হাসলো। ওর এই হাসির সামনে রোমান কেমন মুগ্ধ হয়ে যায়। এলিনা বলল,
‘তোমার মনটা অনেক বড়, রোমান। এই যে আমার সঙ্গে কথা বলছ, এটা তোমার মহত্ব।’
এ কথার জবাবে রোমান বলল,
‘এলিনা, ওসব কথা বলো না। আমি খুবই সাধারণ একজন মানুষ। খুব সাধারণ বলেই তোমার সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করতে পারিনি। বরং পাগল হয়েছিলাম। তুমি আমার পাগলামিকে উপভোগ করেছ। এখন বলো, কী বলতে চাও আমার কাছে? আসল কথাটা বলে ফেল।’
রোমানের কথার পর আর সময় নষ্ট করল না এলিনা। ও নিঃসংকোচে বলল,
‘ক্ষমা চাই তোমার কাছে। আমাকে ক্ষমা করো।’
এলিনার ক্ষমা চাওয়াকে খুব সহজভাবে নিলো রোমান। এতদিন পর রাগের উত্তাপটাও মিইয়ে এসেছে। রোমানও সহজভাবে বলল,
‘যাও ক্ষমা করে দিলাম। হলো?’
‘না, শেষ হয়নি। তোমার কি তাড়া আছে?’
‘একটু আছে। আমার এক বন্ধুকে ইমিগ্রেশন পুলিশ গ্রেফতার করেছে কাল। ওকে জামিনে ছাড়াতে চেষ্টা করব। যাচ্ছিলাম অ্যাটার্নির কাছে। পথে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।’
‘কী কাকতালীয় ব্যাপার! আমিও এসেছিলাম, তালাতকে ছাড়াতে। কিন্তু এবার ওকে ছাড়াতে পারছি না।’
‘তালাত কে?’
প্রশ্ন করল রোমান। এর জবাবে এলিনা গলা নামিয়ে বলল,
‘যে তোমাকে মেরেছিল এবং যার জন্য আমি মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছিলাম।’
‘ওহ্!’

‘জানতে চাও না তালাত কে?’
‘বলো।’
‘তালাত আমার এক্স হাসব্যান্ড!’
‘কী বললে!’
‘সত্যি বলছি। তালাত আমার এক্স হাসব্যান্ড।’
‘আমি জানতাম, তুমি বিয়ে করোনি!’
‘বিয়ের কথা কাউকে বলতাম না। আমি তালাতকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম, রোমান।’
‘স্ট্র্যাঞ্জ!’
বিস্ময় প্রকাশ করল রোমান। এলিনা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল,
‘কিন্তু তালাত ছিল বিপদগামী; মাদকে আসক্তি ছিল খুব। ফলে বিয়ের দু’মাস পরই ওকে ছেড়ে চলে এসেছিলাম। কিন্তু ও আমাকে ছাড়েনি কখনো। ছায়ার মতো অনুসরণ করেছে আমাকে।’
এ পর্যন্ত বলে থামলো এলিনা। রোমান বলল,
‘থামলে কেনো, বলো।’
‘তোমাকে ও মেরেছিল কেন বুঝতে পারছ?’
‘এখন পারছি। তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতাম, হয়তো তালাত তা পছন্দ করেনি।’
‘ঠিক ধরেছ।’
বলল এলিনা। রোমান কৌতূহল প্রকাশ করে বলল,
‘তারপর বলো। কী হলো?’
‘তালাত আমাকে বাধ্য করে তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিতে। তালাত কথা দিয়েছিল, আমি মিথ্যা সাক্ষী দিলে ও ভালো হয়ে যাবে। নেশা ছেড়ে দেবে। রোমান, তালাতের প্রতি আমার দুর্বলতা আমাকে অন্ধ করে দিয়েছিল।’
‘অন্ধ করে দিয়েছিল মানে? এখন কি অন্ধ নও?’
প্রশ্ন করল রোমান। এলিনার প্রতি রাগটা আরো কমে এসেছে। এতদিন পর ওই রাগ রেখেই বা কী হবে? ভাবল রোমান। নোমানের প্রশ্নে এলিনা বলল,
‘আর কত অন্ধ থাকব? তালাত আরো নিচে নেমে গিয়েছিল। ওকে আমি ডিভোর্স দিয়েছি অনেক আগেই, রোমান।’
‘ডিভোর্স দিয়েছ? তাহলে ওর জন্য এখানে এলে যে!’
‘শেষ বিদায় জানাতে। শেষবারের মতো ও সাহায্য চেয়েছিল আমার। আমি ওর প্রতি করুণা করতে চেয়েছিলাম। অ্যাটার্নি বলেছেন, ওর জামিন হবে না। ফলে করুণাও দেখাতে পারলাম না!’
‘কোনো?’
‘ওর ডিপোর্টেশন অর্ডার ছিল। এর ওপর রবারি করে গ্রেফতার হয়েছে। ওকে খুব দ্রুত পাকিস্তান পাঠিয়ে দেয়া হবে, বললেন অ্যাটার্নি।’
‘ভেরি পেইনফুল!’
‘কী পেইনফুল?’
‘তোমার এক্স হাসব্যান্ডের পরিণতি।’
রোমানের কথার জবাব দিলো না এলিনা। ও চুপ করে রইল। এখনো হাত ছাড়েনি রোমানের। রোমান একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল,
‘তাহলে এখন কী করবে? মিথ্যা সাক্ষী দেবার অনুশোচনা থেকে রেহাই পেলে তো! এবার আমার হাত ছাড়ো।’
এ কথায় চাপা কান্নার আবহে থেকে বেরিয়ে এসে মিষ্টি করে হাসলো এলিনা। সেই ভুবন ভুলানো হাসি। ‘এমন হাসির সামনে জীবন বিলিয়ে দেয়া যায়। অথচ বেকুব তালাত পারিজাত ফুলের সৌরভ ফেলে নষ্ট স্রোতে ভেসে গেল!’ এলিনার হাসিমাধুর্য উপভোগ করে মনে মনে এ কথা ভাবল রোমান। এলিনা চোখেমুখে লজ্জা ফুটিয়ে রোমানের হাত ছেড়ে দিলো। ও বলল,
‘আজকের দিনটির কথা কখনো ভুলব না আমি।’
‘কেন?’

‘আজ থেকে তালাত আমার জীবন থেকে একেবারেই হারিয়ে যাচ্ছে। আর আজই তোমার কাছ থেকে ক্ষমা পেলাম। গ্লানিমুক্ত হলাম।’
‘হুম!’
সম্মতি প্রকাশ করল রোমান। এলিনা বলল,
‘এটাও কেমন কাকতালীয় ব্যাপার দেখ! একদিনেই বিপরীতধর্মী দুটি শাপমোচন। হা-হা-হা!’
কথাটি বলেই এমনভাবে হাসলো এলিনা রোমানের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা অভিমানী ভাবাবেগ পেখম ছড়িয়ে যাচ্ছে। রোমান নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করছে। এলিনা খিলখিল করে হাসছে। রোমানের চোখে সেই পুরনো মুগ্ধতা জেগে উঠছে। এলিনা হাসি থামিয়ে বলল,
‘তুমি কি আমার ফোন নম্বর রাখতে চাও?’
এলিনার প্রশ্নটি কেমন যেন অর্থপূর্ণ। বা এ প্রশ্নে একটা ইঙ্গিত যেন আছে। ভাবল রোমান। রোমানের নীরবতা দেখে এলিনা বলল,
‘ঠিক আছে, তোমার নম্বরটা না হয় দাও। আমিই তোমাকে মাঝে মাঝে ফোন করব।’
এ কথা বলে আবারো ভুবন ভুলানো হাসি উপহার দিলো এলিনা। রোমানের ভেতরে ঝড় শুরু হয়েছে। ও নিজের সেলফোনের নম্বর দিতে বলল,
‘সেভেন ওয়ান এইট, ফোর ওয়ান ফোর...।’
এলিনা নিজের সেলফোনে রোমানের ফোন নম্বর সেভ করল এবং রোমানের সেলফোনে কল করল। রোমানের সেলফোন বেজে ওঠে ফের বন্ধ হয়ে গেল। এলিনা বলল,
‘মিস্‌ কল দিয়ে রাখলাম। ইচ্ছে হলে আমার ফোন নম্বর সেভ করে রেখ।’
‘দেখি, রাখব।’
বলল রোমান। এলিনা হাসিমুখে বলল,
‘তাহলে বিদায় নিচ্ছি। আমাকে ক্ষমা করে দেয়ার তোমার মহানুভবতার কথা ভুলব না, রোমান।’
রোমান এ কথার জবাব দিলো না। এ ব্যাপারটা এখন ওর জন্য বিব্রতকর। ও মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল,
‘এখনো ওই ক্লাবে নাচো?’
রোমানের এ প্রশ্নের অপেক্ষায় যেন ছিল এলিনা। ওর মুখে আকর্ণবিস্তীর্ণ হাসি ফুটে উঠল। ও বলল,
‘আমি আর নাইটক্লাবে নাচি না।’
‘রিয়েলি! হাউ স্ট্র্যাঞ্জ! কেন?’
‘৩ মাস হলো আমি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি। এখন চাকরি করছি।’
‘ওহ্‌। তাহলে তো টিউলিপ নাইটক্লাবের অবস্থা বেহাল। ওরা নিশ্চয় ক্লাব বন্ধ করে দিয়েছে?’
‘কেন এ কথা বলছ?’
‘তুমি নেই, ওই ক্লাব কি চলবে? সবাই তো তোমার নাচ দেখতেই যেত!’
কথাটা বলে রোমান মিটিমিটি হাসলো। এলিনাও হাসলো। ও বলল,
‘সবাই না, তুমি যে আমার নাচ দেখতে যেতে, তা জানি। আমার নাচ দেখাটা তোমার ডিজিজ হয়ে গিয়েছিলো!’
‘শুধু তোমার নাচ নয়, তোমাকেও দেখতে যেতাম। তোমার দিওয়ানা ছিলাম বলতো পারো।’
আজ অকপটে কথাটা বলে ফেললো রোমান। এ কথায় ফের হাসলো এলিনা। বলল,
‘দিওয়ানা, না ছাই! দিওয়ানা হলে ক্লাব ছেড়ে দিতে না। আমাকে দেখতে হলেও যেতে!’
এলিনার কথার জবাবে কি বলবে রোমান? ও কি জানে, ওকে না দেখার কষ্ট ভুলতে প্রতিদিন কত পেগ মদ পান করত ও। কীভাবে নিজেকে সামলেছে ও! কতটা ক্ষরণ ওর হয়েছে, এলিনা কি জানে? একটা সময় ছিল ওর মনে হতো, এলিনাকে দেখতে না পেলে ওর বুকের ভেতরে শ্বাস আটকে যাবে। সেই এলিনাকে ও ভুলে গিয়েছে। মানুষ সবই পারে। সব হারানোর শোকও সহ্য করতে পারে। কথাগুলো তাৎক্ষণিকভাবে ভেবে নিলো রোমান। ও বলল,
‘এলিনা, আমি তোমার এমন দিওয়ানা যে, পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেছি। আমার নিজের আর কিছু অবশিষ্ট নেই।’
রোমানের কথায় খিলখিল করে হেসে উঠল এলিনা। এমন হাসির সামনে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকতে হয়। রোমান মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে রইল। ওর মনে হলো এলিনার হাসির মুদ্রায় মহাকাল এসে থেমে গেছে। ওদের পাশ দিয়ে যে পথচারীরা যাওয়া-আসা

করছে, এটা টের পাচ্ছে না রোমান। ব্রডওয়ে নামের রাস্তা দিয়ে যানবাহন ছুটে যাচ্ছে, এর যান্ত্রিক শব্দ হচ্ছে। কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছে না ও। এলিনার হাসির সামনে রোমানের মতো ফ্রিজ হয়ে আছে যেন মাহেন্দ্রক্ষণ!

পাঁচ.

পথমেলা বসেছে ব্রুকলিনের চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকার বিশাল প্রশস্থ রাস্তায়। এ রাস্তার নাম হয়েছে 'লিটল বাংলাদেশ'। নিউইয়র্কে বাংলাদেশী অভিবাসীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। জনবসতি বাড়লেই বাংলাদেশীরা ওই সব এলাকার নাম পরিবর্তন করার উদ্যোগ নেয়। ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে বাংলাদেশীদের বসবাস বেড়েছে। পার্কচেস্টারে একটি সড়কের নাম ছিল স্টারলিং এভিনিউ। ওই এভিনিউর নাম হয়েছে 'বাংলাবাজার এভিনিউ'। ব্রঙ্কসের বাংলাবাজার এভিনিউ, ব্রুকলিনের চার্চ ম্যাকডোনাল্ড ও ওজোনপার্ক, কুইন্সের এস্টোরিয়ার ৩৬ এভিনিউ, জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রিট, জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউতে বাংলাদেশীদের জনপদে পরিণত হয়েছে। ক্যালোফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের লসঅ্যাঞ্জলেস শহরের একটি এলাকার নাম হয়েছে 'লিটল বাংলাদেশ'। ব্রুকলিনের চার্চ ম্যাকডোনাল্ডের রাস্তার ওপর পথমেলায় দাঁড়িয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী জনপদ বিস্তারের কথা ভেবে নেয় রিয়াজ। ও চার্চ ম্যাকডোনাল্ডের পথমেলায় হাজার হাজার মানুষের ভিড়। পথমেলায় মানুষের কোলাহল, হৈচৈ দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় ও। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলো এই মেলা নিয়ে একটা কমন হেডলাইন করবে যে 'একখন্ড বাংলাদেশ', এটা জানে রিয়াজ। এখান থেকে প্রকাশিত বাংলা ভাষার পত্রিকাগুলোর খবর রাখে ও। একটি পত্রিকার ডেলিভারির কাজ করেছিল ও। তখন থেকে বাংলা পত্রিকাগুলো পড়তে শুরু করে। এখন এসব পত্রিকার নিয়িমিত পাঠক। এই শহর থেকে বাংলা ভাষায় এক ডজন সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হচ্ছে। এক ডজন পত্রিকার মধ্যে ৩-৪টি পত্রিকা কেন বের হয়, এর কারণ জানে না রিয়াজ। ও সব পত্রিকার কোনো মান নেই। নামেই সাপ্তাহিক পত্রিকা। ও সব পত্রিকাগুলোতে পেশাদারিত্বের ছাপ একেবারেই নেই।

পথমেলার প্রবেশ মুখে দাঁড়িয়ে এসব কথা ভাবছিল রিয়াজ। অলকের সঙ্গে ও মেলায় এসেছে। অলক সাধারণত মেলায় আসে না। এ মেলায় আসার কারণ আছে। এ এলাকায় জেনিফার থাকে। অলক জেনিফারের কথা ভাবছে। জেনিফারই ওকে বলেছে মেলায় আসতে। বাংলাদেশীদের মেলা কী রকম হয় তা হয়তো দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছে জেনিফার। কাল জেনিফার ওকে ফোন করে খুব উচ্ছ্বাস ভরা কণ্ঠে বলেছে,

'হায়, হানি। ডু ইউ নো, টুমোরো দেয়ার উইল বি ফেয়ার অর্গানাইজ বাই বাংলাদেশী পিপলস অ্যারাউন্ড ওয়ে মাই হাইজ?'

এ কথাটা এমনভাবে বলল যেন মেলা নামক এক মহাযজ্ঞ বসবে। অলক একটু হচকিয়ে যায় জেনিফারের প্রশ্নে। ও ঠিক জানে না, মেলা কোথায় হচ্ছে বা কেন হচ্ছে। কিন্তু জেনিফারকে এ কথা বলা যাবে না। ও ভীষণ হতাশ হবে, হয়তো কষ্টও পাবে। জেনিফার নিশ্চয় বাংলাদেশীদের মেলার খবর জেনে ওকে খবরটা জানিয়ে চমকে দিতে চায়। অলক টেলিফোনে কথা বললেও জেনিফারের হাসিখুশি মুখটি যেন দেখতে পাচ্ছিল। মেলা সম্পর্কিত অজ্ঞতা সামাল দিতে ও নিজেকে একটু গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। জেনিফার ওর জবাবের দেরি দেখে ফের বলল,

'হ্যালো, হানি। ইউ মাইট বি ওয়ান্ডারিং হাউ আই নো অ্যাবাউট দিস ফেয়ার?'

জেনিফারের কথায় একটু হাফ ছেড়ে বাঁচে অলক। ওর মুখে এক ফালি হাসি ছড়িয়ে পড়ে। ও বলে,

'সুইট হার্ট, আই এম সো এক্সাইটেড! আই কান্ট ইমাজিন, হাউ ইউ কাম টু নো এবাউট দিস ফেয়ার!'

কথাটি মুখে বললেও মনে মনে বলল, 'থাকো ব্রুকলিনের চার্চ মাকডোনাল্ডে। ওই এলাকায় তো মেলা কেন, একটা ছোটখাটো সভা হলেও সাজ সাজ রব পড়ে যায়। আর মেলা মানে তো হৈ-চৈ-এর তুলকালাম কাণ্ড হয়ে যাবার কথা। স্টোর-রেস্টুরেন্টের দেয়ালে পোস্টার, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে সওলাব হয়ে যাবার কথা। বাংলাদেশীদের অনুষ্ঠান বলে কথা! আবেগ-উচ্ছ্বাসের ঢোল কি কম পেটানো হবে? রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় বা স্টোরে কেনাকাটা করতে গিয়ে তুমি পোস্টার পড়ে জেনেছ, ব্রকলিনে বাংলাদেশীদের মেলা হচ্ছে। এটা এমন কি, সপ্তম আশ্চর্যের ঘটনা?' অলকের মনে মনে ভাবনার ছেদ কেটে দেয় জেনিফারের কণ্ঠ,

'ওহ্, নো। ডোন্ট সে লাইক দ্যাট। নাউ, হোয়েন এভার আই হার্ড সামথিং অ্যাবাউট বাংলাদেশ, আই পস ফিউ সেকেন্ড থিংক অ্যাবাউট ইট!'

'ওহ্ মাই গড! আর ইউ লাভ ইন বাংলাদেশ?'

'নটি বয়! আই অ্যাম থিংকিং অ্যাবাউট বাংলাদেশ ফর ইউ!'

'ডু ইউ গো টু বাংলাদেশ উইথ মি?'

অলক টিপ্পনি কাটে। জেনিফারের কণ্ঠে হাসির মুদ্রা,
‘হোয়াই নট? প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও হিলারি ওয়েন্ট বাংলাদেশ। দে আর ভেরি ইমপ্রেসড অ্যাবাউট বাংলাদেশ! আই হ্যাভ ফেসিনেশন টু!’
‘গ্রেট! আই ফিল গুড অ্যাবাউট ইউর কমেন্ট। আই উইডল টেক ইউ টু গো টু বাংলাদেশ।’
‘অল রাইট। শেল ইউ কাম ইন টু বাংলাদেশী ফেয়ার, টুমোরো?
‘অফকোর্স! আই উইল কাম।’
অলক মিথ্যা কথাটি হরহর করে বলে দেয়। জেনিফার বলে,
‘আই উইল কাম টু। আই টুক ডে অফ টু ফেয়ার।’
অলক বুঝে নেয় ওকে মেলায় আসতে হবে। ওকেও কাজ থেকে ছুটি নিতে হবে। জেনিফারকে নিয়ে মেলায় ঘুরতে হবে। জেনিফারের এ আবেগকে উপেক্ষা করা যাবে না। অন্য কেউ হলে ও একটা অজুহাত তৈরি করে নিত। জেনিফারের প্রতি ওর কেমন একটা দুর্বলতা জন্মে গেছে। জেনিফারকে ফিরিয়ে দেয়ার সাহস বা শক্তি অলকের যেন নেই। ‘কেন নেই’ এ প্রশ্নটা ওকে মাঝে মাঝে ভাবায়। এর জবাব ও খুঁজে পায় না। শুধু বুঝতে পারে, জেনিফারের মধ্যে অদ্ভুত একটা আকর্ষণ আছে। এ আকর্ষণের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না অলক। কিংবা ও এ বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে চায় না। চার্চ ম্যাকডোনাল্ডের পথমেলায় দাঁড়িয়ে জেনিফারের কথা ভেবে অলক একটু ভাবুলতায় ডুবে গিয়েছিল। ওর ভাবুলতা ভেঙে দেয় রিয়াজ।
‘কী রে, তোর জেনিফার কোথায়? আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব?’
‘দোস্ত, ও আসবে। একটু অপেক্ষা কর। তোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। তারপর তুই নিজের মতো করে মেলায় ঘুরিস।’
‘কেন, তোদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো যাবে না?’
রিয়াজের প্রশ্নে মিষ্টি করে হাসলো অলক। চোখের তারা নাচিয়ে গলা নামিয়ে ও বলল,
‘দোস্ত, নতুন প্রেম। এ সময়ে থার্ট পার্সনকে ইন করতে দেয়া ঠিক হবে না। জেনিফার যদি তোর প্রতি মুগ্ধ হয়ে যায়!’
‘তুই একটি রাবিশ!’
‘রাগছিস কেন?’
‘নিজের প্রতি আস্থা নেই, প্রেমিকার প্রতি বিশ্বাস নেই- এমন ঠুনকো প্রেম তোর?’
‘বন্ধু, ঘাত-প্রতিঘাত, প্রবঞ্চনার শিকার তুমি হওনি, তুমি এখনো কাঁচা আছ। তুমি ও সব বুঝবে না।’
‘আমি ওসব বুঝতেও চাই না। আমার কনফিডেন্স লেভেল খুব ভালো। আমি আমার প্রেমিকার ব্যাপারে কনফিডেন্ট। আস্থাহীনতা, অবিশ্বাস, সন্দেহ একজন প্রেমিককে তার নিজের অজান্তেই নিঃস্ব করে ফেলে। বুজেছ?’
রিয়াজের কথায় হাসলো অলক। অলকের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে রিয়াজের চিন্তা-ভাবনার অনেক স্থানে ফারাক আছে। এমন কি, ওদের দুজনার জীবন দর্শনের মধ্যে বিস্তর ফারাক। কিছুটা বৈপরীত্যও আছে। রিয়াজ সবকিছু সরলভাবে দেখে, সততার আলোকে বিশ্লেষণ করে, কথা বলে নিজস্ব বিশ্বাসের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে। আর অলকের দেখার মধ্যে আশঙ্কা থাকে, পর্যালোচনায় সন্দেহ থাকে এবং ও কথা বলে প্রবঞ্চনার ভয়ের আভাস দিয়ে। ও সরলভাবে কিছু দেখে না, চিন্তাও করে না। তবে নিজের মধ্যে কপটতাকে ও প্রশ্রয় দেয় না বরং তা দমিয়ে রাখে। আত্মকপটতা দমিয়ে রাখতে রাখতে অলকের মধ্যে এক ধরনের নির্ভর করার মতো সরলতা তৈরি হয়েছে। ফলে মুখে ও প্রবঞ্চনার আশঙ্কার কথা যতই বলুক, নিজের ভেতরে এর তেমন সায় পায় না। অভ্যাসগত কারণে তবু সে এসব কথা বলে। কথাগুলো ভাবছিলো অলক। ওর চুপসে থাকা দেখে রিয়াজ পরিবেশকে হালকা করার জন্য বলল,
‘বন্ধু, তুমি একদিন নিঃস্ব হয়ে যাবে, এমন কথা বলিনি! এমন আশাও করি না। ভয় পেয় না।’
অলক হাসলেও ওর হাসি পুরোপুরি প্রস্ফুটিত হলো না। ও নিজেকে স্বাভাবিক করে রিয়াজের উদ্দেশে বলল,
‘বন্ধু, কী পেলাম বা কতটুকু পেলাম, এ নিয়ে আমার আক্ষেপ নেই। তবে আমি পেয়ে হারাতে চাই না। না পাওয়ার বেদনায় দহন আছে, অপমান নেই। কিন্তু পেয়ে হারানোর বেদনায় দহন-জ্বালার সঙ্গে অপমানের গ্লানিও আছে। হেরে যাওয়ার লজ্জা আছে। তাই, জেনিফারকে পাওয়ার পর থেকে ওকে না হারানোর ব্যাপারে আমি একটু সতর্ক হয়ে আছি।’
‘রিয়েলি!’
‘জেনিফার আমাকে ভীষণ নড়িয়ে দিয়েছে। প্রতারক শ্রেণীর প্রেমিক অলক এখন আশ্রয় চায় জেনিফারের কাছে। বুজলে, বন্ধু?’

অলকের অকপট কথাগুলো ভালো লাগলো রিয়াজের। ওর কথাগুলো রিয়াজের মনে প্রতিধ্বণিত হতে লাগল। রিয়াজ অলকের কথার জবাবে কিছু বলার তাড়না অনুভব করছিল। ও কিছু বলতে যাবে এমন সময় চলে এলো জেনিফার। জেনিফার ওদের সামনে এসেই বিগলিত গলায় অলকের দিকে চেয়ে বলল,
'সরি, ডার্লিং, আই অ্যাম লেট!'
অলক জেনিফারের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল,
'ইটস্ ওকে।'
জেনিফার কৌতূহলি চোখে রিয়াজের দিকে তাকালো। ওকে দেখিয়ে অলক বলল,
'বাই দ্যা ওয়ে, দিস ইস মাই ফ্রেন্ড রিয়াজ।'
জেনিফারের চোখের তারা উজ্জ্বল হলো। ওর মুখে বড় করে হাসির ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল। রিয়াজের দিকে ডান হাত বাড়িয়ে জেনিফার বলল,
'নাইস টু মিট ইউ, রিয়াজ!'
রিয়াজ ডান হাত বাড়িয়ে জেনিফারের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল। ও বলল,
'নাইস টু মিট ইউ, জেনিফার।'
জেনিফারকে দেখে ভালো লাগল রিয়াজের। মেয়েটি সপ্রতিভ। ওর মুখ যেমন মায়াবী, চোখ জুড়ে তেমনি সরলতা। হাসলে ওর শুভ্র দাঁতগুলো ঝলমলিয়ে ওঠে। লম্বায় ৫ ফুট ৩ বা ৪ ইঞ্চি হবে। ছিপছিপে আকর্ষণীয় শরীর। চুল ঘন কালো। হয়তো চুলে কালো রঙ করেছে। স্বর্ণকেশও হতে পারে ওর। খোলা চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে। জেনিফার পড়েছে নেভি ব্লু স্কার্ট ও সাদা রঙের টি-শার্ট। অপূর্ব লাগছে ওকে। অলক রিয়াজের দিকে তাকিয়ে টিপ্পনি কেটে বলল,
'কী রে, অমন হা করে কী দেখছিস? মুগ্ধ হয়ে গেলি না কি?'
এ কথা বলার মধ্যে এক ধরনের গোপন আনন্দ আছে। সুন্দরী প্রেমিকাকে দেখে বন্ধুরা যখন মুগ্ধ হয়, তখন প্রেমিকের মনে এক পশলা আনন্দ ছড়িয়ে যায়। সে সঙ্গে অবচেতন মনে নরোম জোছনার মত এক ধরনের অহঙ্কারও ছড়িয়ে পড়ে। অলক নিজের মধ্যে তা টের পাচ্ছে। প্রপা'র সঙ্গে অলককে যখন রিয়াজ পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, সেদিন রিয়াজের মধ্যেও এই অনুভূতির জন্ম হয়েছিল কি? ভাবে অলক। রিয়াজ অলকের কথা স্মিত হেসে বলল,
'বন্ধু, প্রপাই আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মুগ্ধতা। ওই মুগ্ধতা থেকে আমি বেরিয়ে আসতে চাই না। তবে জেনিফার খুবই সুন্দরী। তোর সঙ্গে মানাবে খুব!'
ওদের বাংলা কথা শুনছিল জেনিফার। ভাষা বুঝতে না পারার অস্বস্তি নিয়ে বলল,
'হোয়াট ডু ইউ টক এবাউট ?'
জেনিফারের প্রশ্নের জবাবে অলক বলল,
'রিয়াজ টোল্ড মি টু গেট মেরি টু ইউ টু-ডে অ্যান্ড নেক্সট টেন ইয়ারস গেট কিডস!'
অলকের রসিকতায় মিষ্টি করে হাসলো জেনিফার। রিয়াজও হাসলো। জেনিফার অলকের উদ্দেশে বলল,
'নটি বয়!'
জেনিফারের এ কথার জবাব অলক দিলো না। রিয়াজ চুপ মেরে গেল। ও মেলার দিকে চোখ রাখল। চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে নেমে আসা গ্রীষ্মের বিকেল উজ্জ্বল রোদে ঝলমল করছে। তাপমাত্রা ৭২ ফারেনহাইট ডিগ্রি। বাতাসে আদ্রতা আছে। এক কথায় চমৎকার আবহাওয়া। মেলায় মানুষের স্রোত। পরিবার পরিজন নিয়ে মানুষ আরো আসছে। এর মধ্যে মেলায় কয়েক হাজার লোক ঢুকে পড়েছে। মেলায় এত মানুষ দেখে জেনিফারের চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে আছে। রিয়াজ জানে, ব্রুকলিন, জ্যাকসন হাইটস, অ্যাস্টোরিয়া, জ্যামাইকায় ও ওজোনপার্কে মেলা হলে বাংলাদেশীরা ভিড় জমান মেলায়। রিয়াজের মনে হলো, জেনিফার ও অলককে ওদের মতো করে ঘুরতে দেয়া দরকার। এ কথা মনে হতেই অলকের উদ্দেশে ও বলল,
'অলক, তুই জেনিফারকে নিয়ে মেলা দেখ। আমি একটু আসছি।'
অলক রিয়াজকে বলল,
'কেন? তুই আমাদের সঙ্গে থাকবি না?'
'তোরা দু'জন মেলা দেখতে থাক। আমার এখানে একটা কাজ আছে। কাজ সেরে এসে তোদের সঙ্গে যোগ দেব।'
'কাজটা পরে সেরে নিস।'
'না, বন্ধু। পরে হয়তো ভুলে যাব। কাজটা গুরুত্বপূর্ণ। তোরা মেলায় ঢুকে পড়। আমি আসছি।'
রিয়াজের কথায় ঘাড় নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করল অলক। রিয়াজ জেনিফারের দিকে তাকিয়ে বলল,

‘ইনজয় দ্য স্ট্রিট ফেয়ার, জেনিফার। আই অ্যাম কামিং ভেরি সুন।’
‘ওকে, রিয়াজ।’
বলল জেনিফার। এ কথা বলার সময় জেনিফার অলকের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ও অলকের বাম হাতের মুঠোতে নিজের ডান হাতের মুঠোবন্দি করে নিলো। এ যেন নির্ভর করার মত প্রেমিকের কাছে প্রেমিকার সমর্পণের সহজাত প্রকাশ। রিয়াজের এ দৃশ্যটা ভালো লাগল। প্রপাকে ও এত ভালোবাসে, কিন্তু প্রপা ওর কাছে কখনো এভাবে সমর্পিত হয়নি। হতে পারে বাঙালি নারী এভাবে নিজেকে সমর্পিত করতে পারে না। মনে মনে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে নেয় ও। রিয়াজের কেন জানি মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ও হাত তুলে অলক ও জেনিফারকে বিদায় জানিয়ে উল্টোদিকে ঘুরে হনহন করে হাঁটতে লাগল। ও হাঁটতে লাগলো কলমিলতা গ্রোসারির দিকে। ওর কেন জানি এ মুহূর্তে শায়লাকে দেখার খুব ইচ্ছে হলো। হঠাৎ জন্ম নেয়া এ ইচ্ছে কোনো অর্থ নেই, কারণও নেই। তবু ও কলমিলতা গ্রোসারির দিকে হাঁটছে।
শায়লার আজ মন খারাপ। সকাল থেকেই ওর মন ভীষণ খারাপ হয়ে আছে। মন খারাপ হবার সঙ্গত কারণও আছে। আজ সকালেই ও জানতে পেরেছে ওর স্বামী জয়নাল ভণ্ড-প্রতারক চরিত্রের লোক। জয়নাল ওর সঙ্গে ভয়ানক প্রতারণা করে ওকে বিয়ে করেছে। নোয়াখালিতে জয়নালের স্ত্রী রয়েছে। ওই স্ত্রীর গর্ভে ৩টি সন্তানও আছে। শায়লাকে বিয়ে করার আগে এবং পরে কখনো এ কথা বলেনি জয়নাল। এখানেই শেষ নয়, ব্রুকলিনে স্বামী পরিত্যক্ত একজন মহিলাকে গত মাসে সে কলমা পড়ে বিয়ে করেছে। এ দেশে একাধিক বিয়ের আইনগত বৈধতা নেই বলে ইসলামি রীতি মোতাবেক ওই মহিলাকে বিয়ে করেছে জয়নাল। আজ সকালেই এসব কথা জানতে পেরেছে ও। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতো সংবাদ। প্রথমে এ সংবাদ শুনে ওর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। গলা শুকিয়ে যায়। বুকের ভেতর ‘ধরফর’ শব্দ হতে থাকে। মনে হচ্ছিল ও জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শায়লা নিজেকে সামলে নেয়। ওর ভেতরে ঝড় বইছে। অসহায় গুমোট কান্না হু হু করছে। চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসতে চাইছে। কিন্তু ও কাঁদছে না। শায়লা ওদের গ্রোসারি খুলেছে। বিয়ের খবর ফাঁস হবার পর থেকে জয়নাল সকাল থেকে লাপাত্তা। নিজেকে স্বাভাবিক ও কাজে ব্যস্ত রাখতেই শায়লা গ্রোসারির ঝাপ খুলে স্টোরে বসেছে। পথমেলার কারণে স্টোরে তেমন ক্রেতা আসছে না। এটা ভালোই লাগছে শায়লার। আজ বেচাকেনা নিয়ে ভাবনার কিছু নেই। নিজের ভাগ্য বিপর্যয়ের করুণ কাহিনী নিজের মধ্যে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে বসে বেচাকেনার হিসাব করে কী হবে? আত্ম-জিজ্ঞাসায় নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চায় ও। এর মধ্যে দু’জন কাষ্টমার দোকানে ঢুকে পন্য কেনা সংক্রান্ত প্রশ্ন করে শায়লার কাছ থেকে কোনো জবাব না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে গেলো। এ নিয়ে ওর ভ্রুক্ষেপ নেই। ওর মাথা যেন ভন ভন করে ঘুরছে। বুকের গহীনে যন্ত্রণা তোলপাড় করছে। চরম লজ্জায় ওর মাথা নুয়ে আসতে চাইছে। কিন্তু কাউকে কিছু বলতে পারছে না। নিজের কষ্টের কথা বলার মতো কেউ নেই ওর। আত্ম-গ্লানির যন্ত্রণায় যখন একপর্যায়ে ওর দু’চোখ থেকে টপ টপ করে অশ্রুজল গড়িয়ে পড়ছিল, ঠিক তখুনি স্টোরে প্রবেশ করল রিয়াজ। এ কি কাকতলীয় কোন ঘটনা, নাকি বিধাতার নির্মম পরিহাস? নইলে ঠিক আজ রিয়াজ কেন আসবে? এর বেশি কিছু আর ভাবতে পারল না শায়লা। ও চোখের জল মুছার চেষ্টা করল না। রিয়াজ নীরব কান্নায় মুষড়ে পড়া শায়লাকে দেখে ভীষণ হচকিয়ে গেল। ও অবাক চোখে চেয়ে রইলো শায়লার মুখের দিকে। শায়লার ঠোঁট দুটি তির তির করে কাঁপছে। ও কথা বলতে পারছে না। রিয়াজকে দেখে ও অবাক হবার অভিব্যক্তি প্রকাশ করল না। ওর বিস্ময় বোধের চেয়ে বেদনার ভার অনেক বেশি। তাই ওর দৃষ্টিতে রিয়াজকে দেখার বিস্ময়টুকু ফুঠে উঠল না। রিয়াজের কণ্ঠে অস্ফূট স্বর ফুটে উঠল,
‘হোয়াটস হ্যাপেনড্, শায়লা! এনিথিং রং?’
মনের গহীন থেকে উঠা আসা আশঙ্কা ধ্বণিত হলো যেন। রিয়াজের আতঙ্ক ভরা প্রশ্ন। রিয়াজের সঙ্গে শায়লার সম্পর্ক বলতে মোটা দাগের কিছু নয়। অথচ ওর চোখের জল দেখে কী আকুতি ফুটে উঠল রিয়াজের কণ্ঠে-ভাবলো শায়লা। ও নিজের ভেতরের কান্না সামলে নিয়ে মুখে শুকনো হাসি ফুটিয়ে বলল,
‘আপনি! এখানে? নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না।’
এর জবাবে কিছু বলল না রিয়াজ। ও শায়লার ভার হয়ে থাকা মুখের ভাষা পড়ার চেষ্টা করছে। শায়লা ফের বলল,
‘আজ কি ভুল করে কলমিলতা গ্রোসারিতে এলেন?’
শায়লার বিষণ্ন চোখে চোখ রেখে রিয়াজ বলল,
‘ভুল করে কি না, জানি না। মেলায় এসেছি মাত্র, হঠাৎ আপনাকে দেখতে মন চাইলো। তাই চলে এলাম।’
এর জবাবে কিছু না বলে শায়লা রিয়াজের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। যেন ওর কথাটা সত্যি কি না, তা পড়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। রিয়াজ প্রশ্ন করল,

‘আপনি কাঁদছিলেন কেন? কোনো সমস্যা হয়েছে?’
এ প্রশ্নে মাথা নিচু করে শায়লা বলল,
‘কেনো সমস্যায় পড়লে কি হবে?’
‘না, মানে...!’
‘সমস্যায় পড়লে আমাকে উদ্ধার করবেন? আমার পাশে দাঁড়াবেন?’
শায়লার এ প্রশ্নে বিব্রত হলো রিয়াজ। ও কি বলবে, বুঝতে পারল না। ওর বিব্রতবোধকে আরো উস্কে দিয়ে শায়লা বলল,
‘আমার সর্বস্ব লুট হয়ে গেছে, রিয়াজ। আমি ভীষণ রকম প্রতারণার শিকার হয়েছি!’
‘কী হয়েছে? আমি আপনার জন্য কী করতে পারি বলুন!’
‘আপনি কি করবেন? আমার সমস্যা...!’
‘তবু বলুন, আমি কি করতে পারি?’
‘আপনি কি আমাকে আশ্রয় দিতে পারেন?’
শায়লার প্রশ্নটি বিব্রতকর। শায়লা ঠোঁটকাটা স্বভাবের মেয়ে। মনে যা আসে, মুখে তাই বলে ফেলে। ওর কোনো কিছু আটকায় না। রিয়াজ সংকোচ বোধ করে বলল,
‘আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনি কী বলছেন। আপনার কি হয়েছে, আগে খুলে বলুন তো!’
শায়লার নিজেরই মনে হচ্ছে ওর হিতাহিত জ্ঞান ঠিক নেই। ও কী সব আবোল-তাবোল বকছে। ও নিজেকে শুধরে নেয়ার চেষ্টা করে। ও বলল,
‘রিয়াজ, জয়নাল আমার সঙ্গে ভয়ানক প্রতারণা করেছে!’
‘কী করেছে সে?’
‘আমি আজই জানতে পারলাম যে, আমাকে বিয়ে করার আগে জয়নাল দেশে বিয়ে করেছিল। ওই সংসারে তার দুটি সন্তানও আছে। গত মাসে সে ব্রুকলিনেও এক ডিভোর্সি মহিলাকে কলমা পড়ে বিয়ে করেছে!’
‘বলেন কি, সর্বনাশের কথা দেখছি!’
আঁতকে ওঠে রিয়াজ। শায়লা বলে,
‘তাই তো প্রলাপ বকছি। কিছু মনে করবেন না। কী বলতে গিয়ে আপনাকে কী বলে ফেলেছি!’
‘না, না। মনে কিছু করছি না।’
‘ধন্যবাদ। যাই হোক, আপনাকে দেখে ভালো লাগছে।’
‘কিন্তু আমি তো শক্ড্।’
‘সমস্যা তো আমার। আপনি কেন শক্ড্ হবেন?’
‘তাই বলে ..., শক্ড হব না!’
‘আমি তো আপনার কেউ না।’
শায়লার কথাটি রিয়াজের মনে কেমন যেন বিঁধলো। ও এর জবাবে কিছু বলল না। কণ্ঠ নামিয়ে ও বলল,
‘আপনাকে আমি কী হেল্প করতে পারি, বলুন তো?’
এ কথায় শায়লা ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো। ওর হাসি দেখে রিয়াজ জড়তাহীন গলায় একটু সাহস করে বলল,
‘আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আমার খুব ভালো লাগবে। অন্তত এর মধ্য দিয়ে আপনার কেউ একজন হবার সুযোগ তো পাব!’
শায়লা কয়েক পলক চেয়ে রইল। এরপর ও বলল,
‘দু’টি উপায়ে আপনি আমাকে ভীষণরকম সাহায্য করতে পারেন।’
এ পর্যন্ত বলে ও রিয়াজের মুখের দিকে চোখ রাখল। রিয়াজ উৎসাহী গলায় বলল,
‘বলুন, কী দু’টি উপায়। আমি যে কোনো একটি উপায় বেছে নেব।’
‘সত্যি?’
‘সত্যি, কথা দিচ্ছি।’
‘এরপর কিন্তু আর কোনো প্রশ্ন করবেন না। কোনো বাক-বিতণ্ডা চলবে না। যে কোনো একটি উপায় বেছে নিলেই আমি উপকৃত হব।’
‘ওকে, আমি প্রস্তুত। বলুন, উপায় দু’টি কি?’

রিয়াজ নিজেকে প্রস্তুত করে নেয়। এ এক ধরনের খেলা। যে কোনো একটি বেছে নিতে হবে। যেন লটারি। রিয়াজ শায়লার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল,
‘বলুন।’
শায়লা মুখ টিপে হাসলো। রিয়াজকে বাগে পেয়ে ওর যেন মজা লাগছে। ও বলল,
‘একটি উপায় হচ্ছে আর কোনো প্রশ্ন না করেই এখুনি আমার সামনে থেকে চলে যান।’
এ কথা বলে থেমে গেল শায়লা। রিয়াজের কৌতূহলী প্রশ্ন,
‘দ্বিতীয় উপায় কি?’
দ্বিতীয় উপায় বলতে কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকল শায়লা। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল,
‘দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে, এখুনি আমাকে নিয়ে অন্য কোথাও চিরদিনের জন্য পালিয়ে যেতে পারেন।’
এ কথা বলার সময় শায়লার কণ্ঠ কেমন ভার হয়ে আসে। ও জানে, দ্বিতীয় উপায় বেছে নেবে না রিয়াজ। শায়লার দ্বিতীয় উপায়ের কথা শুনে বিব্রত হলো রিয়াজ। তারপরও কয়েকটা মুহূর্ত ও ভাবল। শায়লা বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। ওর মাথার মধ্যে কেমন উদ্ভট চিন্তা কাজ করছে। ও নিজের ভেতর ওলট-পালট ঢেউ টের পাচ্ছে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। বিশেষ করে রিয়াজের সামনে ওর চিন্তা কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। রিয়াজ ওর কাছে প্রশ্ন করল,
‘একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন, শায়লা?’
‘করুন।’
‘আমার জায়গায় আপনি হলে কোন উপায়টা বেছে নিতেন?’
‘প্রথমটা।’
শায়লার চটপট জবাবে রিয়াজ ফ্যালফ্যাল চোখে ওর দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। শায়লার জবাবের মধ্য দিয়ে এক অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে মুক্তি পেল রিয়াজ। ও শায়লার উদ্দেশে বলল,
‘শায়লা, আমি দুঃখিত আপনার কষ্টের কথা শুনে।’
‘আপনি এখুনি চলে যান। আমি একা থাকতে চাই। প্লিজ, আর কথা বলবেন না।’
শায়লার কথাগুলো কেমন স্পর্শ করে গেল রিয়াজের মন। ও আর কথা না বাড়িয়ে কলমিলতা গ্রোসারি স্টোর থেকে বের হয়ে এলো। ও এবার পথমেলার দিকে হাঁটতে লাগল। হেঁটে যেতে যেতে ও অনেক চেষ্টা করলো শায়লার কথা ভুলে যেতে; কিন্তু ভুলতে পারল না। বিঁধে থাকা চোরা কাঁটার মতো শায়লার বিষণ্ন মুখ বারবার ওর মনের পর্দায় ভেসে উঠতে লাগল। রৌদ্রোজ্জ্বল বিকেলটা ওর কাছে হঠাৎ করে কেমন ফিকে লাগছে। কিছুক্ষণ আগেও যে বিকেলটা ছিল করোজ্জ্বল আলোয় ঝলমলে, সেই বিকেলটাই এখন কেমন নিষ্প্রভ লাগছে ওর। এক বিকেলের পৃথক দুই রূপ হয় কি?

ছয়.

কুকুরটির নাম সোফি। সোফির গায়ের রঙ বাদামি। লেজের ওপরের অংশ বাদামি রঙের উপর ছিট ছিট গোলাকার সাদা রঙ, দেখলে মনে হবে সোফির লেজে নকশা আঁকা হয়েছে। ওর মুখে সবসময় একটা নিরীহ ভাব ফুটে থাকে; কিন্তু ও ততটা নিরীহ নয়। সোফিকে কোলে নিয়ে রোমানের গাড়ির দিকে এগিয়ে এলেন মাইকেল ডগলাস। মাইকেল ডগলাস রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী। তার রেস্টুরেন্টে ওয়েটারের কাজ করে অলক। অলকের অনুরোধে রোমান প্রতি মঙ্গলবার মি. ডগলাস ও তার কুকুর সোফিকে ডাউনটাউন থেকে আপটাউনে নিয়ে আসে এবং পরে আবার আপটাউন থেকে ডগলাস ও সোফিকে পিক করে ডাউনটাউনে নামিয়ে দেয়। সপ্তাহের একদিনের রুটিন ওয়ার্ক। কুকুরকে ভয় পেলেও রোমান মি. ডগলাস ও তার পোষা কুকুর সোফিকে বাসা থেকে স্কুলে নেয়া-আসার কাজটি সোৎসাহে করছে। রোমান ওর গাড়ির গেট খুলে দাঁড়িয়েছিল। সোফি গাড়ির কাছে এসে অনেকটা লফিয়ে গাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল। সোফির পেছনে পেছনে গাড়িতে গিয়ে বসলেন মি. ডগলাস। রোমান মুখে হাসি ঝুলিয়ে লম্বা পা ফেলে গাড়ির ড্রাইভিং সিটে গিয়ে বসল। সোফি গাড়িতে ঢুকে মি. ডগলাসের কোলে গিয়ে বসল এবং ডগলাসের গালে ওর গাল ঘষতে লাগল। ওর মুখ কেমন একটা শব্দ হতে লাগলো। মি. ডগলাস সোফির পিঠ হাতড়ে ওর মুখে একটা দীর্ঘ চুমু খেলেন। পেছনে তাকিয়ে এ দৃশ্যটি দেখে রোমান কেমন শিউরে উঠলো। সোফি ‘চুকচুক’ শব্দ করে আনন্দ প্রকাশ করছে। সোফি একটু আহলাদ পেলে মাইকেল ডগলাসের কোলে চড়ে বসে। কখনো লাফ, কখনো ঢুঁ মারবে এখানে সেখানে। সোফির বয়স দেড় বছর হবে। দেখতে বেশ নাদুস-নুদুস। সোফির আচরণে উগ্রতা দেখে মি. ডগলাস ওকে সপ্তাহে একবার স্কুলে নিয়ে আসছেন। সোফিকে স্যোসাল বানাতে

চান ডগলাস। ম্যানহাটনের লেক্সিনটন এভিনিউ ও ৯৮ স্ট্রিটের কর্নারে কুকুরের স্কুল। এই স্কুলে প্রতিদিন ১০-১২টি কুকুর স্যোসাল ও কোয়াইট থাকার আচরণ বা ব্যবহার শিখতে আসে। এমন স্কুল বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়। রোমান নিউইয়র্কে এসে বিভিন্ন স্থানে 'অ্যানিমেল হসপিটাল' ও 'অ্যানিমেল স্কুল' 'অ্যানমেল স্যালুন' দেখে প্রথমে ভীষণ অবাক হয়েছিল। বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের জন্য পর্যাপ্ত হাসপাতাল-স্কুল নেই, আর এ দেশে এখানে সেখানে পশুদের হাসপাতাল-স্কুল। রোমান একটি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জেনেছে যুক্তরাষ্ট্রে ৩০ শতাংশ নাগরিক বাড়িতে কুকুর বা বেড়াল পোষেন। একেকটি কুকুর বা বেড়ালের পেছনে মাসে ৩০০ থেকে ৫০০ ডলার বা কখনো এরও বেশি ব্যয় হয়। একটি কুকুর বা বিড়ালকে প্রতি মাসে দু'বার গোসল করাতে হয়, নখ কাটাতে হয়। একটু উগ্র আচরণ দেখলে তাকে 'স্যোসাল এটুচুয়েট' শেখাতে নিয়ে যাওয়া হয় বিশেষ স্কুলে। এসব কথা জানার পর রোমান অনেকক্ষণ থ' বনে গিয়েছিল। এ দেশে শুধু মার্কিনীরা কুকুর পোষেন, তা নয়। কিছু কিছু বাংলাদেশী পরিবারও মার্কিনী কায়দায় কুকুর বা বেড়াল পুষছে। নিউইয়র্কের অভিজাত এলাকা লং আইল্যান্ডে বাস করেন এমন কয়েকটি বাংলাদেশী পরিবার যত্ন করে কুকুর-বিড়াল পুষছে। ঢাকাতেও কেউ কেউ বিদেশ থেকে আনা কুকুর-বেড়াল বাড়িতে পোষেন, এটা জানে রোমান। কিন্তু কুকুর-বেড়ালকে হাসপাতাল, সেলুন ও স্কুলে পাঠানোর কথা ও কখনো শোনেনি। মাইকেল ডগলাসের কুকুরকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া-আসার কাজটি পেয়ে ভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়েছে ওর। ম্যানহাটনে সব ইয়োলো ক্যাবে কুকুর-বেড়াল নিয়ে যাত্রীরা উঠতে পারেন না। এ শহরে হাজার হাজার ইয়োলো ক্যাব ও লিমোকার ২৪ ঘন্টা বিরামহীন ছুটে বেড়াচ্ছে। ইয়েলো ক্যাব বা লিমো কারের ড্রাইভার হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান থেকে আসা অভিবাসী। আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের অভিবাসীরাও এ পেশায় রয়েছে। এসব ট্যাক্সির মুসলমান চালকরা গাড়িতে কুকুর-বেড়াল তুলতে চান না। আর কুকুর-বেড়াল গাড়িতে তোলার বাধ্যবাধকতাও নেই। ফলে গাড়ির ড্রাইভাররা সহজেই পেটস সমেত যাত্রীদের ফিরিয়ে দিতে পারছেন। অলক একদিন এমনভাবে ধরলো যে, রোমান পানসে মুখে ওর মালিক ও তার কুকুরকে লেক্সিনটন ও ৯৮ স্ট্রিটে অবস্থিত কুকুরের স্কুলে নিয়ে যেতে রাজি হলো। কুকুরকে ভীষণ ভয় পায় রোমান। কুকুর দেখলে ওর গা কেমন ছমছম করে। সেই রোমান এখন প্রতি মঙ্গলবার মি. ডগলাস ও তার কুকুর সোফিকে ওয়েস্ট ভিলেজ থেকে তুলে আপ-টাউনে নামিয়ে দিচ্ছে। আবার ২ ঘণ্টা পর তাদের তুলে নিয়ে এসে ওয়েস্ট ভিলেজে ফিরে আসছে। সপ্তাহান্তে একদিনের বাধা কাজ। ভাড়ার চেয়ে বকশিস বেশি। রোমানের পুষে যায়।

মাইকেল ডগলাসের ম্যানহাটানের মিডলে ও ডাউনটাউনে তার দুটি পশ রেস্টুরেন্ট রয়েছে। দু'টি রেস্টুরেন্টই চুটিয়ে ব্যবসা হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই ভাগ্যের অন্বেষণে মাইকেল ডগলাসের দাদা জার্মান থেকে এ দেশে এসেছিলেন। তার বাবা ম্যানহাটনে রেস্টুরেন্ট ব্যবসা চালু করেছিলেন। ডগলাস বাবার ব্যবসাকে আরো প্রসার করেছেন। এসব কথা আলাপচারিতায় ওকে মি. ডগলাস বলেছেন। তিনি নিজের গাড়িতে কেন সোফিকে স্কুলে নিয়ে যান না, এর কারণ জানে না রোমান। এ প্রশ্ন ও মাইকেল ডগলাসকে কখনো করেনি। এসব কথা ভাবতে ভাবতে গাড়ি চালাচ্ছিল ও। হঠাৎ ডগলাস রোমানের উদ্দেশে প্রশ্ন করল,

'মি. রোমান, ডু ইউ নো, ডক্টর ইউনূস? হু গট নোবেল প্রাইজ!'

ডক্টর ইউনূসের কথা শুনে রোমানের মনটা ভরে গেল। একজন আমেরিকানের মুখ ডক্টর ইউনূসের নাম শুনছে, মন ভরবে না কেন? রোমান উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলল,

'উই নো ভেরি মাচ ডক্টর ইউনূস। উই লিভ ইন সেম সিটি, ভেরি ক্লোজলি। উই লিভ ইন বিটুইন কাপল অব ব্লকস।'

'ওহ্ রিয়েলি!'

'ইয়েস স্যার। উই লিভ ইন মিরপুর। মিরপুর মিন ঢাকা।'

হরহর করে কথা বলে রোমান। নোমানের কথায় মি. ডগলাস বিস্মিত হয়ে যান। রোমান পেছনের সিটে বসা ডগলাসের মুখটা দেখতে পারছে না। দেখতে পারলে বুঝতে পারত রোমানের কথা সে বিশ্বাস করেছে কি না। তবে আমেরিকানরা সাধারণত সবকিছু বিশ্বাস করে। ওরা সচরাচর মিথ্যা কথা বলে না বলে অন্য কেউ মিথ্যা বললে তা ধরতে পারে না। রোমানও তেমন মিথ্যা কথা বলেনি। মিরপুরে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়। ওখানে থাকেন ডক্টর ইউনূস। রোমানের বাড়িও মিরপুরের সাড়ে এগারতে। ব্লকের হিসাব করলে ওদের বাড়ি থেকে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের দূরত্ব ব্লক একটু বেশি হবে। কিন্তু একই এলাকা বলা যায়। ডক্টর ইউনূসকে নিয়ে মার্কিনীদের এত মাতামাতি কেন বুঝতে পারে না রোমান। তবে এতে রোমান বেশ খুশি। ডক্টর ইউনূসের জন্য মার্কিনীদের কাছে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে ও। মার্কিনীরাও সম্মানের চোখে দেখে। মার্কিন মুল্লুকে অভিবাসী হিসাবে বাংলাদেশীরা কর্মঠ, সৎ ও দীর্ঘক্ষণ কাজ করতে পারে- এমন ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে বাংলাদেশীদের সুনাম দিনদিন বাড়ছে। তবে কয়েকজন

ব্যক্তি রিয়েল এস্টেট ও মর্টগেজ সেক্টরে ভয়াবহ জালিয়াতি করায় বাংলাদেশীদের ভাবমূর্তি একটু ক্ষুণ্ন হয়েছে। ওই প্রতারকদের নিয়ে মার্কিন পত্র-পত্রিকায় সচিত্র সংবাদও ছাপা হয়েছে। এ নিয়ে রোমানের মনে চাপা ক্ষোভ আছে। এ মুহূর্তে মাইকেল ডগলাসের মুখে ডক্টর ইউনূসের কথা শুনে ও বিগলিত হয়ে উঠে। ও বলল,
'হোয়াই ইউ আস্কিং অ্যাবাউট ডক্টর ইউনূস?'
রোমানের প্রশ্নে মি. ডগলাস বলল,
'আই ওয়ান্ডার, হাউ কুড গ্রামীণ ব্যাংক ডিস্ট্রিবিউট লোন টু পিপলস হু হ্যাভ নো কোলেটারেল অ্যান্ড গেট পেইড ব্যাক অলমোস্ট ১০০% ফ্রম দ্যাট পুওর পিপলস। হাউ ইট পসিবল? আই অ্যাম সিওর, দে আর অনেস্ট। আই রেসপেক্ট অল পুওর পিপলস অব বাংলাদেশ! আই নো অ্যাবাউট ইট ফর ডক্টর ইউনূস, ইউ নো?'
'ইয়েস স্যার। আই আন্ডারস্ট্যান্ড।'
'বাট আই থিংকিং, হোয়াই বাংলাদেশ বিকাম ফাইভ টাইমস চ্যাম্পিয়ন ফর করাপশনস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড! বাট দ্য পিপলস অব বাংলাদেশ আর অনেস্ট অ্যান্ড হার্ডওয়ার্কিং। সারপ্রাইজিং!'
ডগলাসের কথায় কেমন তন্ময়তা এসে যায় রোমানের। ওর ভালো লাগে। ডগলাস বাংলাদেশের সাধারণ মানুষদের নিয়ে এভাবে চিন্তা করেছে, অথচ রোমান নিজেও এভাবে ভেবে দেখেনি। ও বলল,
'আই অ্যাম সারপ্রাইজড লুকিং এট ইউর ইন্টারেস্ট অ্যাবাউট বাংলাদেশ!'
এর জবাবে ডগলাস বলল,
'ইয়েসটার ডে, আই গট এ চান্স টু মিট ডক্টর ইউনূস এট নাইন ওয়াই ইন ম্যানহাটন!'
'ওহ, রিয়েলি!'
'ইয়েস! আই ওয়াজ দেয়ার। আই লিসেন্ড হিজ স্পিচ অ্যাবাউট মাইক্রোক্রেডিট।'
মি. ডগলাসের কথা শুনে রোমান বুঝতে পারল সে বাংলাদেশ নিয়ে কেন এত আগ্রহী হয়েছেন। বাংলাদেশের গর্ব ডক্টর ইউনূস মার্কিনীদের কাছে সম্মানিত ব্যক্তি। মনে মনে ও বলল 'ডক্টর ইউনূস পুঁজিবাদ বিশ্বের একটা সুদখোর দানব। মাইক্রোক্রেডিট এটাও তার নিজের আবিষ্কৃত পদ্ধতি নয়। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ কর্মসূচির অনেক আগেই কুমিল্লা এলাকার একটি সমবায় সমিতি মাইক্রোক্রেডিট পদ্ধতি চালু করে। ডক্টর ইউনূস বৈদেশিক বিনিয়োগের সাহায্যে এ পদ্ধতিকে আরো ব্যাপক আকারে চালু করে বাংলাদেশে। বিশেষ করে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও হিলারি ক্লিনটনের জোরালো সমর্থনে তিনি বিশ্বব্যাপী আলোচনায় চলে আসেন। নোবেল পুরস্কারও পান মার্কিন লবিংয়ে। প্রেসিডেন্ট ওবামা ২০০৯ সালের ১২ আগস্ট তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মার্কিন পদক ফ্রিডম পদকও গলায় পরিয়ে দেন। যে ঈর্ষণীয় পুরস্কারগুলো তিনি পেয়েছেন, এর উজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে যায়, গ্রামের হত-দরিদ্র মানুষের কাছ থেকে চড়া সুদ আদায়ের প্রক্রিয়া বিবেচনা করলে।'
কথাগুলো রোমান মনে মনে বললেও মুখে বলল,
'ডক্টর ইউনূস ইজ ভেরি রেসপেক্টেবল পারসন টু আস। হি ইজ ওয়ান অব দ্য গ্রেটেস্ট সান অব আয়ার নেশন। উই আর প্রাউড অব হিম!'
রোমানের কথা শুনে ডগলাস খুশি হলেন। তিনিও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বললেন,
'উই আর প্রাউড অব হিম অলসো! আওয়ার গভর্মেন্ট হ্যাজ গিভেন হিম হাইয়েস্ট অ্যাওয়ার্ড। ইউ নো?'
'থ্যাংক ইউ স্যার! থ্যাংকস ফর প্রেজিং অ্যাবাউট ডক্টর ইউনূস। আই ফিল, ইউ আর প্রেজিং মি!'
'রাইট। ইউ ডিজার্ভ ইট!'
'থ্যাংকস, স্যার!'
রোমান আর কথা বাড়ল না। ডগলাস আর কথা বাড়াবেন বলে মনে হলো না। তিনি ওর সঙ্গে এত কথা কখনো বলেননি। আজ বললেন। ডক্টর ইউনূস তাকে মুগ্ধ করেছেন। মনে মনে নোমান ডক্টর ইউনূসকে ধন্যবাদ দিলো। ও জানে, মি. ডগলাস আজ ওকে বেশি টিপস্ দেবেন। যাত্রীদের সঙ্গে ভাব জমে গেলে তারা টিপস্ দিতে কার্পণ্য করে না। নোমানের মনে স্বস্তিদায়ক আনন্দ ঢেউ তুলছে। ওর গাড়ি এফডিআর সাউথ ধরে ছুটে চলে এসেছে হাডসন সড়কের কাছে। হাডসনে এক্সিট নেবার সময় ওর ফোন বেজে উঠল। ফোন সেটের স্ক্রিনে তাকিয়ে দেখল অলকের ফোন। এই সময় অলক কখনো ওকে ফোন করে না। নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যাপার। মিঃ ডগলাসের সামনে ও কখনো ফোন রিসিভ করেনি। ও ফোন রিসিভ করল। ও প্রান্তে অলক,
'গাড়িতে বস আছে, না?'
'হুম্।'

ছোট্ট করে গলা নামিয়ে জবাব দিলো রোমান, যাতে মি. ডগলাস বিরক্ত না হোন। অলক বলল,
'শোন, একটা সমস্যা হয়ে গেছে। প্রপা বস্টন থেকে চলে এসেছে। আজই ও বিয়ে করতে চায় রিয়াজকে। রিয়াজ বুঝতে পারছে না কি করবে।'
'বলিস কি!'
'তুই বসকে বাসায় নামিয়ে ব্যাটারি পার্কে চলে আয়। আমি যাচ্ছি। প্রপা-রিয়াজ ওখানে আছে। আলোচনা করতে হবে। বুঝলি?'
'বুঝেছি। আমি আসছি।'
'দেরি করিস না। তাড়াতাড়ি চলে আয়।'
'তুই কোথায়?'
'আমি ট্রেন থেকে উঠেছি মাত্র। ব্যাটারি পার্কে যাচ্ছি। তুই চলে আয়।'
'ওকে বন্ধু, আমি আসছি।'
বলে রোমান সেলফোন অফ করে দিলো। ওর মনের উচ্ছ্বাস মিইয়ে গেল। প্রপার নিশ্চয় কোনো সমস্যা হয়েছে। নইলে হঠাৎ করে বস্টন থেকে চলে আসবে কেন? রিয়াজ কি ওকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তুত? প্রশ্নটা ওর মনে ঘুরপাক খেতে লাগল।
ব্যাটারি পার্ক ম্যানহাটানে ডাউন টাউনের শেষ প্রান্তে। এখান থেকে স্ট্যাটেন আইল্যান্ড ও স্টাচু অব লিবার্টির ফেরি ছাড়ে। পার্কের কাছে স্টাচু অব লিবার্টি। এ পার্ক থেকে স্টাচু অব লিবার্টি দেখা যায়। এই স্টাচু অব লিবার্টি মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার প্রতীক। এ প্রতীক যুক্তরাষ্ট্রের আইডেন্টিটি, আমেরিকানদের দৃপ্তময় অহঙ্কার। রোমান ওর গাড়ি পার্কিং গ্যারেজ পার্ক করে হনহন করে বাটারি পার্কের দিকে ছুটে চলল। বেশিদূর হাঁটতে হলো না। পার্কের প্রবেশ মুখের কাছে একটি বেঞ্চে ওরা ৩ জন বসে আছে। রিয়াজকে চিন্তিত দেখাচ্ছে, প্রপা কেমন নির্বিকার আর অলক ভাবলেশহীন। প্রপার পাশে রিয়াজ ও রিয়াজের পাশে অলক বসে আছে। বিকেলের সোনারোদ উপচে পড়েছে হার্ডসন নদী, ব্যাটারি পার্কে। গাছের ডালপালায় আটকে গেছে মিষ্টি সোনা রোদ। ডালপালার ফাঁক গলে রোদের কুচি গড়িয়ে নেমেছে। রোদ তাতানো উজ্জ্বল বিকেলে একটি বেঞ্চে বসে থাকা ৩ জনকে কেমন অপূর্ব লাগছে। কে বুঝবে, ওরা ৩ জন এক গভীর সংকটের সমাধান খুঁজছে? রোমান পা চালিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। ওরা ৩ জন রোমানের উপস্থিতি টের পেল না। রোমান নিজের উপস্থিতি জানান দিতে বলল,
'তোমরা কি ইহজগতে আছ?'
রোমানের কথায় রিয়াজ, প্রপা ও অলক একসঙ্গে ওর দিকে তাকাল। ৩ জোড়া চোখে বিষণ্ন হাসির দ্বীপশিখা জ্বলে উঠল। ওরা মুখে কিছু বলল না। রোমান মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল,
'তোমরা এমন সুন্দর এক বিকেলে মুখ গোমরা করে বসে আছো? আশ্চার্য!'
ওর কথার জবাবে অলক বলল,
'বসবি?'
বেঞ্চে বসার জায়গা নেই। পাশের বেঞ্চে বসে আছে এক জোড়া বুড়োবুড়ি। তাদের পাশে বসে কথা বলা অস্বস্তিকর। তাছাড়া সিটে বসে থেকে দীর্ঘক্ষণ গাড়ি চালাতে হয় বলে বসতে ভালো লাগে না রোমানের। ও অনেক সময় দাঁড়িয়ে থাকতে পছন্দ করে। রোমান বলল,
'না, আমি বসব না। আমি দাঁড়িয়েই কথা বলবো। কী হয়েছে, বল।'
রোমানের কথায় অলক বলল,
'প্রপা বস্টন থেকে চলে এসেছে। ও আর ওর খালা-খালুর বাড়িতে ফিরে যাবে না।'
'এটাই প্রবলেম? ইজ ইট বিগ প্রবলেম?'
জানতে চাইলো রোমান। অলক বলল,
'এটা কি বিগ প্রবলেম নয়?'
'এটা আর কি এমন সমস্যা? প্রপাকে আপাতত কারো বাসায় তুলে দিলেই হলো!'
রোমানের কথার জবাব দিতে রিয়াজ মুখ খুলল। ও বলল,
'ব্যাপারটা সে রকম নয়, রোমান।'
'কী রকম তা আমাকে খুলে বল।'

রোমানের উদ্দেশে রিয়াজ বলল,
‘প্রপা আমাকে দু’ মাস আগে বলেছিল, ওর গ্রাজুয়েশন হবার পরপরই ওকে বিয়ে করতে হবে। ও গ্রাজুয়েশনের পর আর বষ্টন থাকতে চায় না।’
‘কেন?’
‘ওখানে ও কম্ফোর্ট ফিল করছে না। ওর খালা ওর জন্য এক পাত্র ঠিক করে বসে আছেন। ওকে বিয়ে করার কথা বলছে। ওকে কোথাও তুলে দেয়ার বিষয় নয়।’
‘ওহ্!’
রিয়াজ বলল,
‘প্রপা বিয়ের কথা বলছে। ও আর বস্টন ফিরতে চাচ্ছে না।’
‘বিয়ে করতে সমস্যা কোথায়? বিয়ে করে ফেল!’
বলল রোমান। রিয়াজ রোমানের দিকে তাকিয়ে বলল,
‘হুট করে বিয়ে করে ফেলা যায়? বিয়ের জন্য একটা প্রস্তুতি দরকার। নিজেদের বাসা দরকার। খরচপাতির ব্যাপারও আছে। তাই না?’
রিয়াজের কথার কোনো জবাব দিলো না প্রপা। ও কেমন অভিমান ভরা চোখে তাকাল রিয়াজের দিকে। নোমান বুঝতে পারছে প্রপা বিয়ের ব্যাপারে ডেসপারেট। অলক রিয়াজের দিকে তাকিয়ে বলল,
‘রোমান যা বলছে, মন্দ কি? বিয়ে তো করতেই হবে। আর তোরা তো দু’বছর হলো চুটিয়ে প্রেম করছিস। এখন সংসার শুরু করে দে।’
রিয়াজ কিছু বলল না। ও প্রপাকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু বিয়ের করার জন্য একটা প্রস্তুতি নিতে চায়। কিন্তু প্রপা ওসব কথা শুনতে চাচ্ছে না। রোমান ও অলক বিয়ের কথাই বলছে। ও একটু ভাবতে লাগল। রোমানের মনে হলো রিয়াজও বিয়ের ব্যাপারে অহেতুক ভয় পাচ্ছে। বিয়ের জন্য এত প্রস্তুতি নেয়ার কিছু নেই। প্রপাকে রিয়াজ মনেপ্রাণে ভালোবাসে। ভালোবাসার মানুষকে বিয়ে করার জন্য যে কোনো সময় প্রস্তুত থাকা উচিত। ভয় বা ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়ার কিছু নেই। ভয় বা ভাবনা ও দ্বিধাগ্রস্ততার কারণে অনেক প্রেমিক-প্রেমিকা বিয়ে করতে পারে না। বাকি জীবন তারা একে অন্যকে না পেয়ে হা-পিত্তেস করেন। অনেকটা আকস্মিভাবে প্রপা রিয়াজকে বিয়ে করার কথা বললেও রিয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হওয়া উচিত ছিল। প্রেমিকারা প্রেমিকের সাহস পছন্দ করে। ভীরু প্রেমিক কখনোই শ্রদ্ধার পাত্র হতে পারে না। আজ যদি প্রাপাকে রিয়াজ ফিরিয়ে দেয়, প্রপা অনেক কষ্ট যেমন পাবে তেমনি খুব হতাশও হবে। মনে মনে এসব কথা ভেবে রোমান রিয়াজের দিকে তাকিয়ে জোরগলায় বলল,
‘রিয়াজ, আমি তোকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।’
‘কি প্রশ্ন?’
‘তুই তো প্রপাকে ভালোবাসিস, তাই না?’
রোমানের প্রশ্নে বিস্ময় প্রকাশ করে রিয়াজ বলল,
‘তুই কি প্রশ্ন করছিস? প্রপাকে ভালোবাসি মানে? প্রপা হচ্ছে আমার বুকের নিঃশ্বাস! বন্ধু হয়ে তুই কী আবোল-তাবোল প্রশ্ন করছিস?’
‘বন্ধু, তাহলে চলো, আমরা বাসায় যাই। আজ তো সময় নেই। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আনুষ্ঠানিক বিয়ের জন্য কাল সকালে তোদের সিটি হলে নিয়ে যাব। আর ইসলামি রীতিতে আজ রাতেই মাওলানা ডেকে এনে কলমা পাঠ করিয়ে তোদের বিয়ে পড়িয়ে দেব।’
রোমানের কথায় রিয়াজ অসহায় চোখে, অলক হাসিমুখে এবং প্রপা প্রচ্ছন্ন লাজুক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল। অলক বলল,
‘মামা, ওদের বিয়ে না হয় হলো। আজ রাতে প্রপা থাকবে কোথায়, শুনি? ওরা তো বাসা নেয়নি। এর সমাধান কী হবে?’
রোমান অলকের দিকে তুচ্ছ হাসি বিলিয়ে বলল,
‘ভেরি সিম্পল, মামা! আজ আমরা দু’জন অন্য কোথাও গিয়ে থাকব। ওরা থাকবে আমাদের বাসায়। তুমি তোমার জেনিফার সুন্দরীকে ফোন করো। চলো, আমরা আজ রাতে আটলান্টিক সিটিতে গিয়ে জুয়া খেলে আসি। ওদের বাসর রাত হয়ে যাক। কাল নতুন বাসাও খুঁজব।’
রোমানের কথায় উৎফুল্ল হয়ে গেল অলক। ও বলল,
‘দোস্ত, তুমি তো খুব সহজভাবেই সমস্যার সমাধান করে দিলে। মন্দ নয়!’

অলকের কথায় মাথা নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করল রোমান। ও বলল,
‘অত ভেবে কী হবে? বিয়ে করে ফেললেই সমাধান, বুঝলে?’
‘বাহ্! মামা, তোমার সাহস আছে!’
রোমানকে ফোড়ন কাটলো অলক। রোমান অলকের কথা গায়ে মাখলো না। ও বলল,
‘বন্ধু, চলো জুয়ার শহর ঘুরে আসি।’
‘আমি কি জেনিফারকে ফোন করব?’
বলে অলক শার্টের পকেট থেকে সেলফোন বের করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।
রোমান কিছু বলতে যাচ্ছিলো। রিয়াজ ঘোষণা দেয়ার মতো কণ্ঠে বলল,
‘ওকে বন্ধুরা। আমি ঘোষণা করছি, আজ রাতেই কলমা পড়ে আমি প্রপাকে বিয়ে করব এবং কাল সিটি হলে গিয়ে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারবো।’
রিয়াজের ঘোষণায় অলক ও রোমান দুজনে হাততালি দিয়ে ‘আমিন’ বলে উঠল একসাথে। প্রপার মুখে বড় করে হাসি ফুটে উঠল। রিয়াজের ভেতরে জমে থাকা ভয় হঠাৎ করে মিলিয়ে যেতে লাগল। রোমান এসে যেন জমে থাকা অন্ধকারে এক পশলা আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। প্রপাকে ছাড়া রিয়াজ হয়তো বাঁচবে না, অথচ ওকে বিয়ে করতে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না।
অলক প্রপার দিকে তাকিয়ে বলল,
‘মিস প্রপা, আজ আপনাকে আমার বন্ধু রিয়াজের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করাতে চাই। আপনি কি রাজি আছেন?’
প্রপা হাসিমুখে বলল,
‘রাজি, রাজি, রাজি!’
রিয়াজ বলল,
‘আমাদের কে বিয়ে পড়াবে?’
এ কথার জবাবে সোৎসাহে রোমান বলল,
‘যে কোনো মসজিদে গেলেই ইমাম সাহেবকে বললে বিয়ে পড়িয়ে দেবেন। জ্যাকসন হাইটসে থাকেন একজন ইমামকে আমি চিনি। চলো, তার কাছে যাই।’
রোমানের কথা শেষ হতেই প্রপা রিয়াজের দিকে তাকিয়ে বলল,
‘তুমি কি বিয়ের জন্য প্রস্তুত? নাকি আরো ভাববে?’
এ কথায় রিয়াজ মুখ টিপে হাসলো। ও প্রপার চোখে চোখ রেখে বলল,
‘ডার্লিং, আজ এসেই হঠাৎ করে বিয়ের কথা বলেছ বলে একটু নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম। বিয়ে বলে কথা! এখন আর নার্ভাস ফিল করছি না।’
‘তাই?’
‘হুম। এখন মনে হচ্ছে, বিয়ে আর এমন কি শক্ত কাজ! চলো, জ্যাকসন হাইটসে ইমামের কাছে যাই।’
অলক বিদ্রুপ করে বলল,
‘এতক্ষণ শালা, বিয়ের কথা শুনে কাঁপছিলে! এখন তো দেখছি ইমামের দিকে দৌড়াতে চাচ্ছ!’
রোমান ওর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলল,
‘বাসর রাতের কথা বলেছি তো!’
এ কথায় ৩ বন্ধু হেসে উঠল। প্রপা একটু লজ্জা পেল। ওদের হাসি থামার পর প্রপা বলল,
‘বিয়ের কথা শুনে রিয়াজের ভাবনা দেখে আমি প্রথমে হতাশ হয়েছিলাম। এখন ওর প্রতি আমার আস্থা বাড়লো। আমি জানি, রিয়াজ আমাকে ভীষণ ভালোবাসে। আমিও বাসি। আমরা বিয়ে করব, সংসার সাজাব, এ তো স্বাভাবিক ব্যাপার। এ নিয়ে ভাবনার কী আছে? প্রস্তুতি নেয়ারই বা কী আছে?’
প্রপার কথায় রিয়াজ মাথা নেড়ে ‘হ্যাঁ সূচক’ সম্মতি প্রকাশ করল। প্রপা রিয়াজের চোখে চোখ রেখে বলল,
‘রিয়াজ, তোমাকে দু’দিন সময় দিলাম।’
‘কিসের জন্য?’
‘বিয়ের জন্য। তুমি সময়ের কথা বলেছিলে। আমি তখন রাজি হইনি। আমি চাইছিলাম, আমাকে তুমি আজই বিয়ে করো। তুমি রাজি হয়েছ, আমার মন ভরে গেছে।’
‘মানে?’

প্রশ্ন করল রিয়াজ। প্রপা বলল,
‘ভয়ের কিছু নেই। আমরা আজই মসজিদে গিয়ে ইসলামি রীতিতে বিয়ে করতে পারি। দু’দিন পরও করতে পারি। তাই না?’
‘হুম।’
‘আমরা কাল সিটি হলে গিয়ে বিয়ের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফরম নিয়ে আসব।’
‘এরপর?’
‘আগে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হবে। তারপর কলমা পড়ে বিয়ে।’
‘ওকে, নো প্রবলেম!’
হাসিমুখে বলল রিয়াজ। ও আর প্রপার সঙ্গে কোনো ব্যাপারে নিজের অনাপত্তি প্রকাশ করতে চায় না। ও প্রপাকে প্রশ্ন করল,
‘তুমি এই দুদিন আমাদের বাসায় থাকবে তো?’
‘না। আমার বান্ধবী থাকে লং আইল্যান্ডে। আমি ওর বাসায় দুদিনের জন্য উঠব। এই দুদিনে তুমি বাসাও ঠিক করবে। পারবে না?’
‘কেন পারব না? সংসার শুরু করতে যাচ্ছি, দায়িত্ববান হতে পারব না?’
দৃঢ়কণ্ঠে বললো রিয়াজ। রোমান ও অলক মুখ টিপে হাসছে। ওরা মজা পাচ্ছে। রোমান রিয়াজকে বলল,
‘বন্ধু, তোরা নিজেরাই তো সব ঠিক করে ফেললি। আমরা কী করবো?’
এর জবাবে প্রপা বলল,
‘চলুন, আজ রাতে জুয়া খেলে আসি। চলুন, আটলান্টিক সিটিতে যাই।’
অলক বলল,
‘জেনিফারকেও নিয়ে যাই। অনেক ফান হবে!’
এ কথা বলেই অলক মোবাইল ফোন বের করে জেনিফারের নম্বর খুঁজতে লাগল।
রিয়াজ বলল,
‘রোমান, অলক তো জেনিফারকে নিতে পারবে। তোর ভাগ্যে কি কিছু নেই?’ রিয়াজের কথায় অলক হো হো হো করে হেসে উঠল। এ যেন পরিহাসের হাসি। হাসি থামার পর অলক বলল,
‘ও শালা তো, ইয়েলো ক্যাবের স্ট্যায়ারিং ধরেই লাইফ শেষ করে দিচ্ছে। ও বান্ধবী পাবে কোথায়?’
অলকের কথায় রিয়াজও হেসে উঠল। রোমানের প্রতি দু’বন্ধুর বিদ্রুপপূর্ণ হাসি। রোমান ওদের হাসির জবাবে কিছু বলল না। প্রপার সামনে মুখ ফসকে বাজে শব্দ বেরিয়ে আসতে পারে। ভেতরের রাগ সামলে নিলো ও। মুখে কিছু না বললেও রোমান এলিনার নম্বর খুঁজতে লাগল। ও জানে না, এলিনা ওর সঙ্গে আটলান্টিক সিটিতে যেতে রাজি হবে কি না। আবার রাজি হয়ে যেতেও পারে। নিজের একাকীত্বকে কে বিসর্জন দিতে চায় না? রোমান একটু দূরে গিয়ে এলিনার ফোন নম্বর বের করে সেন্টবাটম টিপে দিলো। কয়েক মুহূর্ত পর এলিনা ফোন রিসিভ করে বলল,
‘ও, রোমান! আই ওয়াজ ওয়েটিং ইউর কল, বিলিভ মি!’
এলিনা কথাটা এমনভাবে বলল রোমানের মনে হলো এলিনা ওর জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। রোমান চাপা আবেগে কয়েক মুহূর্তে কিছু বলতে পারল না। ওর বুক থেকে দুঃশ্চিন্তার পাথর যেন নেমে গেল। ও প্রান্ত থেকে এলিনা বললো,
‘হ্যালো, রোমান! আর ইউ হিয়ারিং মি?’
রোমান আলতো গলায় বলল,
‘ইয়েস।’
‘সো, আর ইউ ফাইন?’
‘ইয়েস, হানি। ইউ?’
‘আই অ্যাম ফাইন!’
‘এলিনা..;
‘হুম!’
রোমান থেমে গেল। ও এলিনাকে প্রস্তাবটা দিতে পারছে না। জড়তা লাগছে। ও প্রান্ত থেকে এলিনা প্রশ্ন করল,
‘ইউ ওয়ান্ট টু টেল মি..!

‘আই কল ইউ ফর স্পেশাল রিকোয়েস্ট, এলিনা!’
‘ও রিয়েলি! টেল মি, রোমান! হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু টেল!’
‘আজ রাতে আমি আমার দু’বন্ধু ও ওদের দু’বান্ধবীর সঙ্গে আটলান্টিক সিটিতে যাচ্ছি।’
‘সো?’
‘তুমি কি আমার সঙ্গে যেতে পারবে?’
‘হোয়াটস!’
‘আমি কি খুব বেশি কিছু চেয়ে ফেললাম? সো, আই অ্যাম সরি!’
ও প্রান্ত থেকে কোনো জবাব এলো না। রোমান বিব্রতবোধ করছে। ও দেখতে পেল অলক হেসে হেসে কথা বলছে ফোনে। নিশ্চয়, জেনিফার রাজি হয়েছে। রিয়াজ প্রপার হাত ধরে বসে আছে। রোমান অনিশ্চিত অন্ধকারে ভাগ্যদেবীকে খুঁজছে। ও প্রান্ত থেকে বেশ কিছুক্ষণ পর এলিনার কণ্ঠ শুনতে পেল ও।
‘রোমান, আর ইউ সিরিয়াস! আই কান্ট থিংক, হোয়াট আর ইউ টকিং অ্যাবাউট!’
‘ইউ নো, এলিনা, আই অ্যাম ভেরি লোনলি পারসন।’
ও প্রান্তে এলিনা ফের চুপ। রোমান লাইন কাটলো না। কানে ফোন ধরে আছে। প্রায় ২ মিনিট পর এলিনা বলল,
‘ওকে, আই অ্যাম কামিং। হয়ার আর ইউ?’
এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রোমানের দু’চোখ থেকে জলের দু’টি ধারা টপটপ করে গড়িয়ে পড়ল। এ অযাচিত জলের উৎস বা চোখ থেকে ভূমিতে জলের সমর্পণের কারণ কি, জানে না ও। এর কোনো অর্থ আছে কী- নেই, তাও অনুভব করতে পারল না রোমান। ওর বুক ভেঙে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছে। এলিনার সঙ্গে ওর সম্পর্ক কোন পর্যায়ে দাঁড়াবে, বা আদৌ কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠবে কি না, তা ও জানে না। তবে আজ এলিনা ওর সঙ্গে আটলান্টিক সিটিতে গেলে দু’বন্ধু বিদ্রুপের জবাব দেয়া হয়ে যাবে। এটাই বা কম কি? এ কথা ভাবতে ভাবতে ও নিজের ভেতরে উথলে ওঠা ঝড় সামলে নেয়ার চেষ্টা করছে। রোমানের কোনো জবাব না পেয়ে ও প্রান্ত থেকে এলিনা ফের বলল,
‘রোমান, আর ইউ হিয়ারিং মি!’
এর জবাবে রোমান পাগলের প্রলাপ বকার মতো একটা কথা বলে ফেলল,
‘এলিনা, আই লাভ ইউ!’
এ কথায় এলিনার হাসির শব্দ শুনতে পেল ও। এলিনা খিলখিলিয়ে হাসছে। রোমান নার্ভাস হয়ে গেল। কথাটা বলার পর একটা ভালোলাগা এবং অস্বস্তি একসঙ্গে ওর অনুভূতিতে ছড়িয়ে পড়ল। ও এলিনার জবাবের অপেক্ষা করছে। এলিনার হাসির শব্দ একসময় থামলো। কিন্তু এলিনা কিছু বলছে না। রোমান বলল,
‘এলিনা, আমি সিরিয়াসলি কথাটি বলেছি। তুমি কিছু বলো।’
ও প্রান্ত থেকে এলিনা বিষণ্ন কণ্ঠে বলল,
‘রোমান, এ কথাটি আমি আরো অনেকবার অনেকের কাছ থেকে শুনেছি। বাট, আই কান্ট বিলিভ ইট। আমি কাউকে ট্রাস্ট করতে পারি না। আই অ্যাম সরি, রোমান!’
এ কথা বলেই রোমানকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে এলিনা ফোনের লাইন কেটে দিলো। রোমানের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। গুপ্তধন পেয়েও হারিয়ে ফেলার কষ্ট ওকে গ্রাস করল। ও ফের ফোন করল এলিনাকে। এলিনা ওর ফোন রিসিভ করল না। রোমান আরো কয়েকবার এলিনাকে ফোন করে ব্যর্থ হলো। ও অসহায় চোখে তাকালো স্টাচু অব লিবার্টির দিকে। যেন স্টাচু অব লিবার্টির মশাল ওকে হতাশার অন্ধকারে আলোর পথ দেখাবে। ব্যাটারি পার্কে একরাশ বিষণ্নতায় রোমানও যেন স্টাচু অব লিবার্টির মতো অনড় দাঁড়িয়ে আছে। চেষ্টা করেও ও পা নড়াতে পারছে না। এমন কখনো হয়নি ওর। কবি মুজিবুল হক কবীরের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম ‘পা যে আমার অনড় পাথর’। ওর এ মুহূর্তে ওই কবির বইয়ের নামটি মনে পড়ল। কারণ, রোমানের মনে হচ্ছে, ওর পা দু’টিও অনড় পাথর হয়ে গেছে।

সাত

দরজা খুলে শায়লাকে দেখতে পাবে, এটা কল্পনাও করেনি রিয়াজ। শায়লাকে দেখে এতটাই অবাক হলো যে, ও কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। গোধূলিতে সূর্য ডুবে যাবার সময় পশ্চিমাকাশে যে বিষণ্ন সন্ধ্যার ছবি ফুটে ওঠে, শায়লার

মুখে সে রকম ম্লান হাসি। ওর হাসির মধ্যে লজ্জা ও বেদনার সংমিশ্রিত আবহ ফুটে আছে। শায়লার এই ম্লান হাসি রিয়াজকে দমকা হাওয়ার মতো স্পর্শ করে গেলো। শায়লা রিয়াজের মুখের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে মুখ নামিয়ে নিলো। রিয়াজ কী বলবে বুঝে উঠতে পারল না। শায়লা কেন ওর কাছে এসেছে, এটা ও স্পষ্ট করে বুঝতে না পারলেও ওর মনে হলো শায়লার বিপদ বেড়েছে। শায়লার জন্য কী করতে পারবে বা আদৌ কিছু করতে পারবে কি না, রিয়াজ মনে মনে একটু ভাবল। ওর মনের কথা বুঝতে পারল যেন শায়লা। ও মুখ খুলল,
'আপনার কাছে আমি কোনো সাহায্য চাইতে আসিনি।'
শায়লার কথাটি ওকে চমকে দিলো। শায়লা সাহায্য চাইতে আসেনি, তবে কেন এসেছে ওর কাছে? শায়লাকে রিয়াজ ওর বাড়ির ঠিকানা কখনো দেয়নি। অথচ শায়লা ওর বাড়িতে এসে হাজির এবং বলছে 'কোনো সাহায্য চাইতে আসিনি'। রিয়াজ শায়লার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে বলল,
'আপনাকে দেখে বিস্ময়ের রেশ কাটছে না। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনি আমার বাড়িতে কিভাবে এলেন এবং কেন এলেন?'
এ কথায় মুচকি হাসলো শায়লা। ওর এই হাসিতে বিষণ্নতা নেই। রিয়াজ স্বাভাবিক হয়ে আসছে। শায়লা রিয়াজের চোখে চোখ রেখে বলল,
'কলিবেলের শব্দ শুনে ভেবেছিলেন প্রপা এসেছে?'
এ কথায় রিয়াজ আরেকবার ধাক্কা খেলো। ও বুঝতে পারলো শায়লা ওর সব খবর রাখে। প্রপ্রার কথাও সে জানে। এতে স্বস্তিবোধ করল রিয়াজ। ও বলল,
'আপনি কি আজ আমাকে চমকে দিতে এসেছেন? তাহলে বলছি, আমি কিন্তু সত্যিই চমকে গেছি।'
'রিয়েলি?'
'হুম্। আপনাকে দেখে আমার মুখে কথাই ফুটছিল না। আমি ভাষামূক হয়ে গিয়েছিলাম।'
রিয়াজের কথা শুনে এবার খিলখিলিয়ে হেসে উঠল শায়লা। রিয়াজ শায়লার এভাবে হেসে ওঠার কারণ বুঝতে পারল না। একটু আগেও ওর মুখায়বে গোধূলির বিষণ্নতা জমে ছিল। এখন এমনভাবে হাসলো মনে হলো পাহাড়ের পাদদেশ থেকে চঞ্চল ঝরণা লাফিয়ে নামছে। রিয়াজ একটু বিব্রত হলো। হাসি থামলো শায়লার। এরপর ও রসিকতা করে বলল,
'শুনেছি, ভাব গভীর হলে ভাষা হারিয়ে যায়। কিন্তু আমাকে নিয়ে আপনার তো কখনো ভাবই হয়নি। ভাষামূক হলেন কেন? না কি আজ হঠাৎ করে ভাবের গভীরতায় ডুবে গেলেন?'
রিয়াজ বুজতে পারলো শায়লার উৎকণ্ঠিত হবার মতো বিপদে নেই। বিপদ মাথায় নিয়ে ও রিয়াজের কাছে আসেনি। বিপদগ্রস্ত হলে এমন রসিকতা করত না।। বিপদগ্রস্তরা সাধারণত বিষণ্ন ও গম্ভীর থাকে। রিয়াজ মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল,
'যেহেতু প্রপার কথা জানেন, সেহেতু অকপটে বলছি, আমার যাবতীয় ভাব, ভাবের গভীরতা, মুগ্ধতা যা-ই বলেন, ওই প্রপাকে কেন্দ্র করেই। আমি ভাষামূক হলেও প্রপার অনুরাগে ভাষামূক হই। আবার ওর অনুযোগে বা রাগেও ভাষামূক হই।'
রিয়াজ কথাগুলো বলে নিজেকে হালকা করে নিলো। রিয়াজের কথায় একটু লজ্জা পেল যেন শায়লা। ও বলল,
'অতিথি না হই, অপরিচিত তো নই। পরিচিতজনকে দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে কথা বলবেন? বাসার ভেতরে আসতে বলবেন না?'
শায়লার কথায় লজ্জা পেল রিয়াজ। ওর মনে হলো দরজায় দাঁড়িয়ে ও শায়লার সঙ্গে কথা বলছে। ও লজ্জিতকণ্ঠে বলল,
'আই অ্যাম সরি। আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম যে আপনাকে বাসার ভেতরে আসতে বলবো। আসুন, ভেতরে আসুন।'
কথাটা বলে দরজা থেকে সরে দাঁড়ালো রিয়াজ। শায়লা নিঃসংকোচে রিয়াজের বাসায় প্রবেশ করল।। দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেই লিভিং রুম। শায়লা লিভিং রুমে ঢুকে সোফার ওপর বসল। রিয়াজ দরজা বন্ধ করে দিলো। এরপর ও গিয়ে বসল শায়লার মুখোমুখি একটি সোফায়। একটা অজানা অস্বস্তি ওর ভেতরে ছড়িয়ে পড়ছে। শায়লা ওর কাছে কেন এসেছে ও বুঝতে পারছে না। শায়লা ওর মনের অস্বস্তি টের পেল। ও বলল,
'আমি জানি, আমাকে দেখে খুব অবাক হয়েছেন আপনি। হয়তো আমি কেন এসেছি, এ নিয়ে কিছু একটা ভাবছেন।'
'না, মানে...।'
'আমি আগে বলছি, শুনুন।'
এ কথা বলে রিয়াজকে থামিয়ে দিলো শায়লা। রিয়াজ বলল,
'ঠিক আছে বলুন।'

‘আমি জ্যাকসন হাইটসে এসেছি এয়ারলাইন্সের টিকিট কাটতে। কাল যখন এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন আপনাকে আপনার বাড়ি থেকে বের হতে দেখি।’
‘ওহ্, তাই?’
‘আজ এয়ারলাইন্সের টিকিট নিয়ে যাবার সময় ভাবলাম দেশে চলে যাচ্ছি, যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই। বলতে পারেন আপনার সঙ্গে দেখা করার অযাচিত সাধ!’
এ পর্যন্ত বলে থামলো শায়লা। রিয়াজের মনে হলো শায়লা ওকে দেখতে এসেছে মনের টানে, ওর মনে কোনো উদ্দেশ্য নেই। রিয়াজের প্রতি শায়লার যে একটা অযাচিত দুর্বলতা আছে, সেটা জানান দিতে শায়লার কোনো সঙ্কোচ নেই। আবার ওকে নিয়ে ওর কোনো স্বপ্নও নেই। ওকে নিয়ে শায়লার মধ্যে এক ধরনের তন্ময়তা আছে। রিয়াজ শায়লার দিকে ভালো করে তাকাল। শায়লা আজ পড়েছে আকাশি শাড়ি। শাড়ির পাড় রয়েল ব্লু। পাড়ে রূপালি সুতার কাজ। আঁচলের রয়েল ব্লু’র রঙ মিলিয়ে ব্লাউজ। কপালে ছোট্ট একটা টিপ পরেছে। টিপটিও নীল। ঠোঁটে লিপিস্টিকের প্রলেপ নেই। সাধারণ সাজের সৌম্য সৌন্দর্য ওর মুখে ফুটে আছে। কয়েক মুহূর্তের পর্যবেক্ষণে শায়লাকে দেখে নিলো রিয়াজ। রিয়াজের পর্যবেক্ষণ দৃষ্টি বুঝতে পারল শায়লা। ও বলল,
‘অমন করে কী দেখছেন?’
শায়লার কথায় হচকিয়ে গেল রিয়াজ। ও হেসে ফেলল। শায়লা মিটিমিটি হাসছে। রিয়াজ অপরাধ স্বীকার করে নেয়ার মতো করে বলল,
‘মাফ করবেন, আপনাকে দেখছিলাম, আই মিন আপনার সাজসজ্জা দেখছিলাম।’
রিয়াজের অকপট স্বীকারোক্তি ভালো লাগলো শায়লার। ও বলল,
‘আপনার সব মুগ্ধতা প্রপার মধ্যে। অথচ ...!’
‘বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে যে দৃষ্টিতে দেখেছি, তাতে অন্যায় কোনো কিছু নেই। অপবিত্রতারও কিছু নেই।’
‘তাই নাকি? দেখার মধ্যে পবিত্র-অপবিত্র বা ন্যায়-অন্যায়ও আছে না কি?’
শায়লার প্রশ্নটা কেমন বিদ্রুপপূর্ণ মনে হলো। রিয়াজ বিব্রতকণ্ঠে বলল,
‘দেখার মধ্যে অনেক কিছুই আছে।’
‘যেমন?’
‘যেমন ধরুন, কারো সৌন্দর্যকে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখার মধ্যে পাপ নেই। এটা পবিত্রতা, ন্যায়সঙ্গত।’
‘আর পাপ কোনটা?’
‘সৌন্দর্যকে কামনার চোখে দেখাটা হচ্ছে পাপ। বা অন্যায়।’
এ কথায় শায়লার মুখে ঈদের চাঁদের মতো আকর্ণ বিস্তৃত এক হাসি ফুঠে উঠল। রিয়াজের কথা ওর ভালো লেগেছে। ও বলল,
‘আপনার কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে আপনি কি জানেন, পুরুষরা প্রতিদিন কত পাপ করছে?’
শায়লার কথায় একটু দ্বন্দ্বে পড়ে গেল রিয়াজ। ওর চোখে প্রশ্নবিদ্ধ দৃষ্টি। এর অর্থ রিয়াজ বলতে পারছে না, প্রতিদিন কতজন পুরুষ কামনার আগুনে পুড়ে পাপ করছে। রিয়াজের কাছ থেকে জবাবের আশা না করে শায়লা বলল,
‘আপনার ধারণার জন্য বলছি, ৯৯ শতাংশ পুরুষ প্রতিনিয়ত এই পাপ করছে। যে কোনো মেয়ে আমার এ ধারণার সঙ্গে একমত হবেন।’
‘হতে পারে। আমি এ নিয়ে তর্ক করছি না।’
‘তবে...!’
‘তবে কি?’
‘আপনি ঐ ৯৯ শতাংশের মধ্যে পড়েন না।’
বলল শায়লা। এ বলার মধ্য দিয়ে রিয়াজকে যেন চারিত্রিক সার্টিফিকেট দিলো ও। রিয়াজ শায়লার মন্তব্য গায়ে মাখলো না। ও ভদ্রতা করে বলল,
‘আমাকে নিয়ে এ কমেন্ট করার জন্য ধন্যবাদ। অন্তত আপনার সাজসজ্জার সৌন্দর্যকে উপভোগ করার অপরাধে অভিযুক্ত হওয়া থেকে রেহাই পেলাম।’
রিয়াজের কথার জবাবে শায়লা ম্লান হেসে বলল,
‘আপনাকে অভিযুক্ত করতে পারলে আমার ভালো লাগত।’

‘মানে?’
‘মানে বুঝতে পারছেন না?’
‘না। ঠিক বুঝতে পারছি না। স্পষ্ট করে বলুন।’
‘অত স্পষ্ট করে বলা যায় না। তবু বলছি, কিছু অভিযোগ ভালোলাগার মধ্যে প্রশ্রয় পেয়ে যায়। ওই অভিযোগটাই আবার ভালোলাগার মধুর স্মৃতি হয়ে যায়। অনেকের জীবনে অর্থাৎ অনেক মেয়ের জীবনে এমন ভালোলাগা আছে, যা বিবেচনা করলে অভিযোগ বা পাপ। আবার ভালোলাগার বিচারে তা পাপ নয়, পবিত্রতা। ভালোবাসাবাসির মধ্যে এ ধরনের অভিযোগ, পাপ বা পবিত্রতার জন্ম নেয়।’
‘তাই না কি?’
বিস্ময় প্রকাশ করে রিয়াজ। শায়লার কথায় কেমন এক ধরনের মাদকতা আছে। ও বলল,
‘আপনি দেখছি, অনেক কিছু জানেন!’
রিয়াজের কথায় স্মিত হাসলো শায়লা। ও বলল,
‘কচু জানি! জানলে কি আর জয়নালের মতো লম্পটকে বিয়ে করতাম, বলুন!’
‘হুম। তা ঠিক। আচ্ছা, আপনি জয়নালকে বিয়ে করলেন কেন?’
প্রশ্নটা করে রিয়াজের মনে হলো প্রশ্নটা করা ঠিক হয়নি। শায়লার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে ওর এত কৌতূহল দেখানো ঠিক হচ্ছে না। শায়লা ওর প্রশ্নের জবাবে বলল,
‘আপনারা মনে করেন, আমেরিকাতে সকলেই নিরাপদ। নারীদের কেউ কিছু বলতে পারে না। আইনের কড়া শাসন আছে, তাই না?।’
‘হুম, তাই তো জানি।’
‘কিন্তু এ দেশেও নারীদের নিরাপত্তা বা স্বাধীনতা তেমন নেই। শুধু হাঁটতে চলতে হয়তো কেউ গায়ে হাত দিচ্ছে না। আর বাকিটা সময় পুরুষের লালসার চোখ আমাদের লেহন করছে।’
‘কী বলছেন!’
‘শুধু তাই নয়। একা একজন নারী এখানে নিরাপদও নয়। একজন নারীকে সবসময় নানা বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়। সুন্দরী হলে তো কথাই নেই। কামুক পুরুষদের উপদ্রব যে কী, তা আপনাকে বলে বুঝাতে পারব না।’
এ পর্যন্ত বলে শায়লা থামলো। ও হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। রিয়াজও আর কথা বাড়াতে চায় না। আলোচনাটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে গেছে। শায়লার নিশ্চয় কোনো কষ্ট আছে। কামুক পুরুষদের যন্ত্রণার কষ্ট। রিয়াজ আর কিছু জানতে চায় না। ওর কষ্টের কথা জেনেই বা কী হবে? শায়লার জন্য তো রিয়াজ কিছু করতে পারবে না। তবে ওর জন্য কেমন সহানুভূতি বাড়ছে রিয়াজের। রিয়াজ যখন এসব কথা ভাবছিল, তখন শায়লার চোখ থেকে টপটপ করে গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা অশ্রু। রিয়াজ ভীষণ ভ্যাবাচেখা খেয়ে গেল। ও কিছু বলতে যাচ্ছিল, এর মধ্যে শায়লা বলল,
‘জয়নালকে আমি কখনোই বিয়ে করতাম না। তাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছি।’
রিয়াজ অস্পষ্টভাবে বলে ফেলল,
‘কোন?’
‘একদিন তুমুল তুষারপাত হচ্ছিল। ইমার্জেন্সি ঘোষণা করল সিটি। দোকান বন্ধ করে ফেললাম। চলে যাব, এমন সময় জয়নাল এলো। আমি তাকে দোকানের চাবি বুঝিয়ে দেবার সময় পশুটা আমাকে জাপটে ধরলো..!
এ পর্যন্ত বলে থেমে গেল শায়লা। ও আর কিছু বলতে পারল। ওর শরীরটা কাঁপছে। গোপন কান্না ওকে এই মুহূর্তে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রিয়াজ জানে না, আজ কেন শায়লা ওর জীবনের গোপন কষ্ট ও লজ্জার কথা ওকে জানিয়ে দিলো। রিয়াজ কিছুই বলতে পারল না। ওদের মধ্যে কেমন গুমোট পরিবেশ নেমে এলো। এমন পরিবেশে আশা করেনি রিয়াজ। ও এখনো জানতে চায়নি শায়লা কী খাবে। এখন কী বলবে ওকে, ভাবতে লাগলো। ওকে কিছুক্ষণের মধ্যেই বের হতে হবে। প্রপাকে পিক্ করতে হবে লং আইল্যান্ড থেকে। এরপর ওরা যাবে সিটি হলে। আজ সিটিহলে গিয়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন করবে ওরা। বিয়ে করতে হলে এই রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়। এরপর যার যার ধর্মমতে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়। ম্যারিজ রেজিস্ট্রেশন ছাড়া বিয়ের বৈধতা নেই এ দেশে। তাই আজকের দিনটি রিয়াজের জীবনের বিশেষ একটি দিন। এমন দিনে শায়লা এসে দিনটির নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। শায়লার ব্যক্তিগত গ্লানিকর কষ্টের কথা শুনে রিয়াজের মন খারাপ হয়ে গেল। ও পরিবেশকে হালকা করার জন্য বলল,
‘শায়লা, আই অ্যাম সরি। আপনার মন খারাপ করে দিয়েছি। আমি জানতাম না...।’

'না, না। আমিই সরি। আমি এসেছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে। আর দেখুন, কথায় কথায় কী সব কথা বলে ফেলেছি।'
'না, না। আমি ভাবতেই পারিনি, এ দেশেও মেয়েরা কত জঘন্য ঘটনার মুখোমুখি হয়। আপনার কথা আমি কখনো ভুলব না।'
এ কথায় মুচকি হাসার চেষ্টা করল শায়লা। ও নিজের চোখের জল মুছে নিয়েছে। নিজেকে স্বাভাবিক করছে। রিয়াজ বলল,
'কী খাবেন বলুন? আমি তো অতিথিকে কিছুই খেতে দেইনি। শুধু কথাই বলে গেলাম।'
'না, না। আমি কিছু খাব না। শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। হয়তো এটাই আমাদের শেষ দেখা।'
শায়লার কথায় বিস্ময় প্রকাশ করে রিয়াজ বলল,
'শেষ দেখা মানে?'
শায়লা বলল,
'শেষ দেখা মানে, আমি কাল বাংলাদেশে চলে যাচ্ছি।'
রিয়াজ বলল,
'শায়লা, আপনি বাংলাদেশে চলে যাচ্ছেন মানে?'
'বাংলাদেশের উদ্দেশে কাল নিউইয়র্ক ছাড়ব। রাত ১১টায় আমার ফ্লাইট।'
'কাল যাচ্ছেন! জেএফকে থেকে?'
'হুম। কাল যাচ্ছি। তাই ভাবলাম আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই।'
কথাটা বলে শায়লা একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে রাখল। রিয়াজ বলল,
'আপনি কি দেশ থেকে আর ফিরবেন না?'
এ প্রশ্নে শায়লা কয়েক পলক তাকিয়ে রইল রিয়াজের মুখের দিকে। এরপর বলল,
'জীবনের এতবড় একটা পরাজয়ের ক্ষত নিয়ে দেশে যাচ্ছি। যে দেশটা আমার সর্বস্ব কেড়ে নিলো, সে দেশটার প্রতি কি কোনো দুর্বলতা থাকতে পারে, বলুন?'
এর জবাবে কিছু বলল না রিয়াজ। শায়লা বলল,
'ডিভি লটারি পেয়ে এ দেশে এসেছিলাম। জীবনের ভুল অংক কষে এখন ফিরছি। ফিরে আসব কি না জানি না। ফিরে আসার মত মনের জোর নেই। অপরদিকে দেশে আমার বাবা-মা, ভাইবোন অপেক্ষো করছেন। তারাও চান না, আমি একা এই দেশে থাকি। তাই..!'
'এখন বুঝতে পারছি। একটা প্রশ্ন করব?'
জানতে চাইলো রিয়াজ। শায়লা বলল,
'করুন।'
'জয়নাল সাহেবকে কি করবেন?'
এ কথায় শায়লার চোখেমুখে বিষণ্নতার ছায়া পড়ল। ও বলল,
'জয়নালকে সাহেব বলছেন! সে তো এক লম্পট, প্রতারক শ্রেণীর ব্যক্তি! সে নারীদের ভোগের পণ্য মনে করে।'
'না, মানে...।'
'জানতে চাচ্ছেন, আমার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক থাকবে বা আদৌ সম্পর্ক থাকবে কি না, এই তো?'
'সে রকমই। জানতে চাইছি, জয়নালকে নিয়ে ফাইনালি কি সিদ্ধান্ত নিলেন।'
'জয়নালকে আমি ডিভোর্স লেটার পাঠিয়ে দিয়েছি। সে ওটা পেয়ে খুব খুশি।'
'রিয়েলি!'
'হ্যাঁ, সত্যি। সে তো খুশি হবেই। সময় সুযোগ পেলে আরেকজনকে ফুসলিয়ে বিয়ে করে ফেলবে!'
'আপনি তাকে সহজেই ছেড়ে দিলেন? এ দেশে তো নারীদের পক্ষে আইন অতন্দ্র প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে!'
রিয়াজের এ কথায় শায়লা হেসে ফেলল। ও বলল,
'আইন কি আমার জীবনের যে ক্ষতি হয়েছে, তা ফিরিয়ে দিতে পারবে?'
'তা ফিরিয়ে দিতে না পারুক, দুষ্টু ও লম্পটকে দণ্ডাদেশ তো দিতে পারবে, তাই না?'
'তা ঠিক। কিন্তু আমি মানসিকভাবে বিপর্যস্থ। এ অবস্থায় একা মেয়ে মানুষ কী করবো, কতটুকু করতে পারবো-তা জানি না। আগে দেশে যাই, এরপর ভাবব কী করা যায়। দেশে থেকে গেলে জয়নাল হয়তো আমার কাছ থেকে বেঁচে গেলো। আর যদি ফিরে আসি, তাহলে ওর বিরুদ্ধে মামলা করব।'

‘এই তো সাহসের কথা বললেন। কেন জানি, আপনার মধ্যে অসহায়ত্ব মানায় না।’
রিয়াজের কথায় ফের হেসে ফেলল শায়লা। এই হাসিটা একেবারেই শুকনো হাসি। অসহায়রা যেরকম হাসে, সে রকম হাসি। রিয়াজ কিছু বলতে যাচ্ছিল, শায়লা বলল,
‘আজ যাচ্ছি। আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। ভাল থাকুন।’
শায়লার বিদায় নেয়াটা মনে মনে কামনা করছিল রিয়াজ। ও স্বস্তিবোধ করল। কারণ, ওকে এখুনি বের হতে হবে। লং আইল্যান্ডে প্রপা ওর বান্ধবীর বাসায় অপেক্ষা করছে। রিয়াজ ওকে নিয়ে যাবে সিটি হলে। শায়লার উদ্দেশে রিয়াজ বলল,
‘আপনাকে কিছু খাওয়াতে পারলাম না। আমারও তাড়া আছে। বের হতে হবে। তাই আপনাকে জোর করলাম না।’
শায়লা বলল,
‘ইটস ওকে। আপনাকে কৈফিয়ত দিতে হবে না।’
‘ধন্যবাদ, শায়লা।’
‘ওয়েলকাম।’
দরোজা লক করে ওর রুম থেকে শায়লার সঙ্গে রিয়াজও বের হয়ে এলো। শায়লা বলল,
‘আমাকে এগিয়ে দিতে হবে না, আপনি যান।’
রিয়াজ সংকোচ প্রকাশ করে বলল,
‘শায়লা, আপনাকে একটা কথা জানাতে চাই।’
‘বলুন।’
‘আজ আমি আর প্রপা সিটি হলে যাচ্ছি। আমরা বিয়ে করতে যাচ্ছি!’
এ কথা শুনে ভীষণ আনন্দ প্রকাশ করে শায়লা বলল,
‘এই সুখবরটা এতক্ষণ বলেননি! আপনি কি মানুষ বলুন তো? এতবড় একটা সংবাদ এভাবে চেপে রেখেছিলেন?’
শায়লার উচ্ছ্বাস দেখে রিয়াজের ভালো লাগলো। ও কিছু বলতে পারল না। শায়লা বলল,
‘ভেবেছিলাম আপনার সঙ্গে দেখা করে চমকে দেব। এখন তো দেখছি, আপনিই আমাকে চমকে দিলেন!’
‘তবে চমকে দেবার জন্য খবরটি জানাইনি।’
‘কংগ্রাচুলেশন!’
‘ওয়েলকাম!’
শায়লার চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হলো। ও রিয়াজের উদ্দেশে বলল,
‘আমি জানি, আপনারা দু’জনে খুব সুখি দম্পতি হবেন। আমি সর্বান্তকরণে এ কামনা করছি।’
‘প্রপাকে আপনার কথা বলব।’
‘তাকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন।’
‘জানাব।’
শায়লা হাত নেড়ে বিদায় নিলো। ও ৭৪ স্ট্রিটের সাবওয়ের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। রিয়াজ দাঁড়িয়ে রইল ওর বাড়ির সামনে। ওর মধ্যে একটা তোলপাড় চলছে। বিয়ে করার ঠিক আগে সবার মধ্যে এ ধরনের তোলপাড় চলে। রিয়াজ অবশ্য একটু নার্ভাসও। তোলপাড়টা এখন বেশি মাত্রায় অনুভব করছে ও। হাঁটতে হাঁটতে শায়লা একসময় ৩৭ এভিনিউ থেকে মিলিয়ে গেল ৭৪ স্ট্রিটের বাঁকে। রিয়াজ পকেটে হাত দিয়ে সেলফোন বের করলো। লং আইল্যান্ডে যাবার আগে প্রপাকে ফোন করতে হবে, ও যেন তৈরি থাকে। প্রপার বান্ধবীর বাসায় ও বসতে চায় না। ও প্রপার নম্বর বের করে সেন্ডবাটন টিপে দিলো। কয়েক মুহূর্ত পার হলো। প্রপার ফোনের রিংটোন বাজছে। ৩ বার রিং বাজার পর প্রপা ফোন ধরল,
‘হ্যালো, রিয়াজ!’
প্রপার কণ্ঠে জড়তা। বিয়ে করার আগ মুহূর্তে মেয়েরা একটু বেশি নার্ভাস থাকে হয়তো। ওর নিজেরও নার্ভাস লাগছে- ভাবলো রিয়াজ। ও বলল,
‘প্রপা তুমি তৈরি হও। আমি আসছি।’
এ কথার জবাবে প্রপা কিছু বলল না। রিয়াজ একটু চিন্তিত হলো। প্রপা কি বেশি নার্ভাস? বিয়ের ব্যাপারে প্রপাই তো বেশি উৎসাহী। রিয়াজ জানতে চাইলো,
‘প্রপা তুমি কি খুব বেশি নার্ভাস?’
‘রিয়াজ, আমি শুধু নার্ভাস নই। আমি খুব শঙ্কিত!’

প্রপার কথা শুনে কেমন ভড়কে গেল রিয়াজ। প্রপার কণ্ঠ কেমন যেন লাগছে ওর। প্রপা কি কাঁদছে? ওর কি কিছু হয়েছে? মেঘ সরিয়ে রোদের ফালি বের হয়ে আসার মতো এ প্রশ্নটা রিয়াজের মনে ঝলমলিয়ে উঠল। ও আশঙ্কা প্রকাশ করে প্রশ্ন করল,
‘আর ইউ ওকে, প্রপা? তোমার কি কিছু হয়েছে?’
ও প্রান্তে প্রপা গুমরে কেঁদে উঠল। রিয়াজ প্রমাদ গুনলো। ও কি বলবে বুঝতে পারলো না। প্রপার কি হয়েছে, সে তা-ও বুঝতে পারছে না। ও ফের বলল,
‘কি হয়েছে আমাকে বলো। তুমি কাঁদছ কেন?’
‘আমি কাঁদছি না। এমনিতেই কান্না এসে যাচ্ছে।’
‘কেন কাঁদছো? কী হয়েছে?’
রিয়াজ অস্থির হয়ে ওঠে। প্রপা কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে বলে,
‘রিয়াজ, আমি আজ বিয়ে করতে পারব না।’
‘কী বললে!’
বিস্ময় ভরা কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে রিয়াজ। ও প্রান্ত থেকে প্রপা বলল,
‘আহা! অমন অস্থির হচ্ছো কেন?’
‘অস্থির হব না? কি বলছ, তুমি?’
প্রপা একটু দম নিলো। রিয়াজ ফের বলল,
‘তোমার কী হয়েছে প্রপা? আমাকে বলো।’
‘বলছি। আগে তুমি মনকে শক্ত করো।’
‘মন শক্ত করব? কী যে বলছ তুমি! আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।’
‘শোনো, আমি কাল ঢাকার উদ্দেশে নিউইয়র্ক ছাড়ছি।’
‘কী বললে? ঢাকায় যাচ্ছ? কালই? কেন?’
রিয়াজের চিন্তার মধ্যে যেন এক উদভ্রান্ত হাওয়া বইতে শুরু করল। প্রপার কথায় ও এলোমেলো হয়ে গেল। প্রপা বলল,
‘আগেই বলেছি, মনকে শক্ত করো। তুমি এমন করলে আমি কার কাছে যাব, বলো তো?’
প্রপার কণ্ঠে অসহায়ত্ব ফুটে ওঠে। রিয়াজ নিজেকে শক্ত করার চেষ্টা করে। হঠাৎ করে প্রপাকে দেশে যেতে হবে-কথাটি শুনে ওর মধ্যে যে ঝড় শুরু হয়েছে, ও তা সামলে নেয়ার জন্য নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে। ও প্রান্ত থেকে প্রপা বলল,
‘তুমি শুনছো? হ্যালো, রিয়াজ? তুমি কথা বলছ না কেন!’
‘শুনছি। বলো।’
‘তুমি রাগ করছো। কিন্তু তুমি কি জানবে না, কেন আমাকে ঢাকায় জরুরিভাবে যেতে হচ্ছে?’
প্রপার কথাটা এমন মোলায়েমভাবে বলল যে রিয়াজের ভেতরের ঝড়টা থেমে গেল। ও বলল,
‘কেনো হঠাৎ করে ঢাকায় যাচ্ছ, বলো?’
কয়েক সেকেন্ড নীরবতা। রিয়াজ অপেক্ষা করছে। প্রপা বলল,
‘আমার বাবা খুবই অসুস্থ। মুমূর্ষু অবস্থায় তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এখন বলো, আমি কি করব?’
প্রপার কথা শুনে ভীষণ লজ্জায় পড়ে গেল রিয়াজ। বাবার অসুস্থতার সংবাদে মেয়ে দেশে যাবে, এটা তো স্বাভাবিক ঘটনা। বরং বাবার অসুস্থতার খবর পেয়েও মেয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসলে সেটা বরং অস্বাভাবিক ও অস্বস্তিকর ঘটনা হবে। প্রপার কাছ থেকে ওর বাবার অসুস্থতার কথা শুনে রিয়াজ কেমন বিষণ্ন হয়ে গেল। ও বললো,
‘সরি, প্রপা। আমি বুঝতে পারিনি। তুমি কি এয়ার টিকিট কিনেছ?’
‘হ্যাঁ। ইন্টারনেটে সার্চ করে ই-টিকিট কিনলাম।’
‘এক্সিসিলেন্ট! কোন এয়ারলাইন্সে যাচ্ছ, কখন ফ্লাইট?’
‘এমিরাটস এয়ারলাইন্সের টিকিট পেয়েছি। কাল রাত ১১টায় ফ্লাইট।’
‘ফিরবে কবে?’
‘ফেরার ডেটটা ওপেন রেখেছি। ঢাকায় আগে যাই, দেখি বাবার কী অবস্থা। এরপর ফেরার ডেট ঠিক করব। তুমি কি বলো?’
‘হ্যাঁ, ঠিকই করেছ। ফেরার ডেট ওপেন রাখাটাই ঠিক হয়েছে।’

টেলিফোনে প্রপার একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল রিয়াজ। প্রপার জন্য বুকের ভেতরটা উথলে উঠল। ওর বাবার অবস্থা কতটা খারাপ কে জানে। রিয়াজ মনে মনে প্রার্থনা করল প্রপার বাবার যেন কিছ না হয়। অন্তত প্রপা যেন ঢাকায় ফিরে ওর বাবাকে দেখতে পায়। অনেকে তার বাবা-মার অসুস্থতার খবর পেয়ে দেশে ফিরে যান। কিন্তু তাদের সকলে দেশে ফিরে বাবা-মা'কে জীবিত দেখতে পান না। নিজের দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে থাকার এই এক বিড়ম্বনা। রিয়াজের কোনো কথা শুনতে না পেয়ে প্রপা প্রশ্ন করল,

'তুমি কিছু বলছ না যে?'

'কি বলব, প্রপা। এ মুহূর্তে শুধু প্রার্থনা করা ছাড়া আর কিছু বলার নেই আমার। তুমি কি লাগেজ গুছিয়েছ?'

বলল রিয়াজ। প্রপা আরেকটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো যেন। ও বলল,

'লাগেজ গুছাচ্ছি। তুমি চলে আসো। আমার হেল্প লাগবে।'

'আমি আসছি, প্রপা। একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে আসছি।'

'কতক্ষণ লাগবে?'

'ধরো হাফ এন আওয়ার। বড়জোড় ১ ঘণ্টা।'

'ওকে আসো। সাক্ষাতে কথা হবে।'

'ওকে।'

রিয়াজ ফোন রেখে দিলো। ওর মনটা বিষণ্নতায় ডুবে গেছে। একটু আগেও ওর মন ছিল গভীর আনন্দে উচ্ছ্বল। একটি দুঃসংবাদ পণ্ড করে দিলো ওদের বিয়ের সব আয়োজন। কেন এমন হয়? এটা কি কারো অভিশাপ? কথাটা মনে হতেই শায়লার মুখ ভেসে উঠল ওর মনের পর্দায়। শায়লা কিছুক্ষণ আগেও বলে গেছে ও সর্বান্তকরণে ওদের মঙ্গল কামনা করছে। অথচ এক চূড়ান্ত মুহূর্তে মঙ্গল পিদিমের দ্বীপশিখা দপ করে নিভিয়ে দিলো অমঙ্গলবার্তা। এটা কি নিয়তির পরিহাস? এ কথা ভাবতে ভাবতে হাঁটতে লাগলো রিয়াজ। ও চারপাশে তাকিয়ে ট্যাক্সি খুঁজতে লাগলো। ওর ভেতরে হু হু শূন্যতা গুমোট কান্না ছড়িয়ে দিচ্ছে। রিয়াজ নিজের মনকে শক্ত করার চেষ্টা করছে। মন কিছুতেই বশ মানছে না!

আট

এক ঘণ্টায় ১১ বার ফোন করল জেনিফার। জেনিফারের কথা প্রথমে গুরুত্ব দেয়নি অলক। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে একপর্যায়ে সিরিয়াস হতে হলো। পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখিকা ম্যাকালি জ্যাকসন লাইব্রেরিতে পাঠকদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। একজন স্বনামধন্য লেখক বা লেখিকা তাঁর পাঠকের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করতেই পারেন। এ নিয়ে জেনিফারের এত উৎসাহিত হবার কী আছে? প্রশ্নটা অলকের। ও অবশ্য এ প্রশ্নটা জেনিফারকে করেনি। জেনিফার যা পছন্দ করে, অলক ওর পছন্দকে গুরুত্ব দিতে চায়। তবে সবসময় মনের সায় থাকে না। সাহিত্য হচ্ছে অলকের কাছে সবচেয়ে অপ্রিয় বিষয়। সাহিত্য নিয়ে মানুষের অতিরিক্ত আগ্রহ ওর কাছে হাস্যকর মনে হয়। কিন্তু এসব কথা মুখ ফুটে কাউকে বলে না ও। জেনিফারকে তো বলার প্রশ্নই ওঠে না। আজ 'সাহিত্যিক' নামক এক 'বিষাদ'-এর মুখোমুখি হতে হবে ওকে। জেনিফার এ পর্যন্ত ১১ বার ফোন করে ফেলেছে। হয়তো আরো কয়েকবার ফোন করবে ও। জুম্পা লাহিড়ির সঙ্গে পাঠক আড্ডায় যোগ দিতেই হবে ওকে। এর অন্যতম এবং প্রধান কারণ হচ্ছে জুম্পা লাহিড়ি বাংলায় কথা বলেন। 'জুম্পা লাহিড়ির পিতা-মাতার বাড়ি কলকাতায়। যদিও এই লেখিকার জন্ম লন্ডনে, তিনি অবলীলায় মাতৃভাষায় কথা বলতে পারেন। জুম্পা লাহিড়ি ইংল্যান্ড ও কানাডায় পড়াশোনা করেছেন। বর্তমানে তিনি বাস করছেন নিউইয়র্কে। বিয়ে করেছেন স্প্যানিশ এক সাংবাদিককে। বাংলা ভাষা জানা এই লেখিকা 'ইন্টারপ্রেটার অব মেলোডিজ' বই লিখে যুক্তরাষ্ট্রের সর্ববৃহৎ পুরস্কার 'পুলিৎজার পুরস্কার' লাভ করেছেন। জুম্পা লাহিড়ির লেখা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হচ্ছে। টেলিফোনে জুম্পা লাহিড়ি সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যগুলো জেনিফার ওকে জানিয়ে দিয়েছে। এমন একজন লেখিকার সঙ্গে আড্ডা দিতে জেনিফার নির্ধারিত সময়ের আগেই ম্যাকালি জ্যাকসন লাইব্রেরিতে চলে গেছে। ওখানে বসে জেনিফার ৫ থেকে ১০ মিনিট পরই অলককে ফোন দিচ্ছে। গাড়ি চালাচ্ছে রোমান। বি কিউ হাইওয়ে থেকে উইলিয়ামবার্গস সেতুতে ওদের গাড়ি ট্রাফিকে পড়ে গেছে। উইলিয়ামবার্গ সেতুতে উঠতেই বাম্পার টু বাম্পার ট্রাফিক। এই হচ্ছে ম্যানহাটান! এই শহরে প্রতিনিয়ত কত শত গাড়ি যাওয়া-আসা করছে। 'উইলিয়ামবার্গ সেতু থেকে অবশ্য বেশি দূরে নয় ম্যাকালি জ্যাকসন লাইব্রেরি। সেতু থেকে নামলে কয়েকটি ব্লক এগুলে বাউরি রোড। এই বাউরি থেকে প্রিন্স স্ট্রিট শুরু। ৫২ প্রিন্স স্ট্রিটে এই লাইব্রেরি। ট্রাফিক না থাকলে

৩ থেকে ৪ মিনিট লাগত'। মনে মনে হিসাব করে রোমান। ও অলককে কিছু বলতে যাচ্ছিল, অলকের ফোন ফের বেজে উঠল। অলক ফোন ধরেই বলল,

'ডার্লিং, আই অ্যাম কামিং। উই আর অন উইলিয়ামবার্গ ব্রিজ। হেভি ট্রাফিক!'

আই অ্যাম কামিং ভেরি সুন! ওকে... ওকে। '

অলক ফোন রেখে দিলো। ও রোমানের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসলো। ঠিক এ সময় গাড়িগুলোর গতি বেড়ে গেল। সারিসারি গাড়ি ছুটছে। ডিলেন্সি রাস্তার ওপর অনেক ট্রাফিক পুলিশ। তারা ইশারা করে গাড়িগুলোকে এগিয়ে যেতে বলছে। ট্রাফিক পুলিশের ইশারায় রেড লাইটেও গাড়িগুলো এগিয়ে যাচ্ছে। অলক হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো যেন। রোমান ডিলেন্সি থেকে রাইট টার্ন নিয়ে হাডসন রাস্তায় গিয়ে পড়ল। রাস্তাটা ফাঁকা। ও অনেকটা ঝড়ের গতিতে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে গিয়ে হাডসন থেকে বাউরিতে লেফট টার্ন নিলো। এ রাস্তায়ও তেমন ট্রাফিক নেই। কয়েকটি ট্রাফিক লাইট পেরিয়ে প্রিন্স স্ট্রিটে লেফট টার্ন নিয়ে ঢুকে পড়ল। একটু এগুতেই লাইব্রেরি পাওয়া গেল। রোমান ইয়েলো ক্যাব চালক বলে ম্যানহাটানের সব ঠিকানা ওর নখদর্পণে। ও গাড়ি থামালো ম্যাকালি জ্যাকসন লাইব্রেরির সামনে। অলকের মন নেচে উঠলো। অলক বলল,

'দোস্ত, তোকে অসংখ্য, অসংখ্য ধন্যবাদ। ড্রাইভার হিসেবে তুই একটা জিনিয়াস!'

অলকের কথা শুনে মুখ টিপে হাসল রোমান। ও বলল,

'গাড়ি থেকে নাম। তোর জেনিফার কিন্তু আবার ফোন করে ফেলবে।'

অলক রোমানের উদ্দেশে অনুরোধের কণ্ঠে বলল,

'তুইও আস না। জুম্পা লাহিড়ির দু'চারটে কথা শুনে যা। জীবনে কাজে লাগবে!'

অলকের কথায় এক ধরনের খোঁচা আছে। রোমান ওর কথা গায়ে মাখলো না। হঠাৎ ওর চোখ ছানাবড়া হয়ে আটকে গেল ম্যাকালি জ্যাকসন লাইব্রেরির গেটে। লাইব্রেরির গেটে ও এলিনাকে দেখতে পেল। গেট দিয়ে ঢুকছিল এলিনা। এলিনাকে এখানে দেখবে রোমান কল্পনাও করেনি। এলিনার সঙ্গে এক যুবককেও দেখতে পেল ও। ওরা দু'জনে লাইব্রেরিতে ঢুকে পড়ল। এমন দৃশ্য আশা করেনি রোমান। ওর বুকের ভেতর মিহিন বেদনার একটা ঝড় উঠল। ওর দৃষ্টি আটকে আছে লাইব্রেরির গেটে। রোমানের দিকে তাকিয়ে অবাক হলো অলক। ও বলল,

'কী রে, কিছু বলছিস না যে! কী দেখছিস অমন হা করে?'

'না, তেমন কিছু না। তুই গাড়ি থেকে নাম, আমি গাড়ি পার্ক করে আসছি।'

'বলিস কি বন্ধু! সত্যি আসবি?'

'আসবে না মানে? আসব। তুই গাড়ি থেকে নাম।'

রোমানের কথায় একটু অবাক হয় অলক। বলে,

'তুই আবার কবে সাহিত্য প্রেমিক হলি!'

অলকের কথার জবাব দিলোনা রোমানের। ওর ভেতরে একটা তোলপাড় চলছে। লাইব্রেরিতে এলিনাকে ঢুকতে দেখে রোমান কেমন একটা শিহরণ টের পাচ্ছে। এলিনাকে 'আই লাভ ইউ' বলার পর ও ফোন রেখে দিয়েছিল। এরপর এলিনা ওকে আর ফোন করেনি। এটা ওর জন্য যেমন লজ্জার তেমনি অপমানেরও। আজ এলিনার মুখোমুখি হয়ে ওই লজ্জার গ্লানি থেকে বের হয়ে আসতে হবে ওকে ভাবলো রোমান। অলক রোমানের নীরবতা দেখে ফের বলল,

'তোর কি হলো বল তো? কী হয়েছে?'

'কিছু হয়নি। তুই গাড়ি থেকে নাম।'

'নামছি। তুই কি সত্যি আসবি?'

'হুম্। আসছি। আর শোন, লাইব্রেরিতে আমি একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলব। তখন তুই সামনে আসবি না। বুঝলি?'

'বলিস কী!'

'হুম্। মনে থাকে যেন!'

'বন্ধু, তুমি তো দেখছি, ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ! তা মেয়েটি কে?'

অলকের চোখ নেচে উঠল রসিকতায়। রোমান মুচকি হাসলো। ও বলল,

'বন্ধু, যা ভাবছো, তা নয়।'

'তাহলে কি? এমনি-এমনি একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলবে?'

'সেটাও ঠিক নয়। তোকে জানাব। আসলে অনেকদিন যাবত ঘুরছি।'

'তুই তো শালা, এক ড্যান্সারের পিছে ঘুরতি! কী যেন নাম বলেছিলি?'

‘এলিনা।’
‘হ্যাঁ, এলিনা!’
‘ওই এলিনাকেই তো লাইব্রেরিতে ঢুকতে দেখলাম!’
বলল রোমান। ওর কথা শুনে অলক বিস্ময় প্রকাশ করে বলল,
‘বলিস কি! ঝুম্পা লাহিড়ি দেখছি অনেক জনপ্রিয় লেখিকা!’
‘আরে বাদ দে, জুম্পা লাহিড়ির কথা! এখন গাড়ি থেকে নাম। আমাকে গাড়ি পার্ক করতে হবে।’
‘ওহ্, নামছি, নামছি!’
এ কথা বলে গাড়ি থেকে অলক নামলো। ওর ভালো লাগছে রোমানও লাইব্রেরিতে যাবে বলে। আর এলিনাকেও দেখার সুযোগ হয়ে গেল। রোমান বলেছিল এলিনা অসম্ভব সুন্দরী! অলক রোমানকে কিছু বলতে যাচ্ছিল, বলতে পারল না। রোমান খুব দ্রুত গাড়ি নিয়ে প্রিন্স স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে গেল। লাইব্রেরির গেটের সামনেই দাঁড়িয়েছিল জেনিফার। অলককে দেখে সে এগিয়ে এলো। অলকের সামনে এসে বিগলিত কণ্ঠে জেনিফার বলল,
‘থ্যাংকস টু কাম অন টাইম।’
‘ওয়েল কাম। আর ইউ ওকে?’
‘ডার্লিং, আই অ্যাম এক্সসাইটেড!’
‘হোয়াই?’
‘ফর জুম্পা লাহিড়ি!’
‘রিয়েলি!’
বিস্ময় প্রকাশ করে অলক। ও বুঝতে পারে না, একজন লেখকের প্রতি পাঠকের এমন তীব্র মুগ্ধতা সৃষ্টি হয় কেন? লেখার মধ্যে কী এমন জাদু আছে? আর লেখায় যদি জাদু থাকেও, লেখকের প্রতি এমন আকর্ষণ তৈরি হয় কেন? অলকের ভাবনার মনযোগ ভেঙে দেয় জেনিফারের কথা।
‘ইউ নো, আই বিলিভ জুম্পা লাহিড়ি উইল গেট নোভেল প্রাইজ! আই হোপ ভেরি সুন!’
‘ও মাই গড! রিয়েলি!’
‘হোয়াই ইউ সে ‘রিয়েলি রিয়েলি’? ডিড ইউ রিড অ্যানি বুক অব হার?’
এ প্রশ্নে ভ্যাবাচোখা খেয়ে গেল অলক। ও জুম্পা লাহিড়ি কেন, অন্য কোনো লেখকের বইও পড়েনি। কলেজ স্টুডেন্ট থাকাকালে বন্ধুদের দেখাদেখি হাতেগোনা কয়েকটি বাংলা উপন্যাস পড়েছিল। বই পড়ার অভিজ্ঞতার মধ্যে এটুকুই যা। এখন মনে হচ্ছে আমেরিকান লেখকদের বই দেদারছে পড়তে হবে ওকে। জেনিফারকে পেতে হলে বই হতে পারে সহায়ক শক্তি। কথাগুলো চট করে ভেবে নিলো অলক। জেনিফার ওর প্রশ্নের জবাব না পেলেও বিষয়টা ভুলে গেলো। জেনিফার প্রহর গুনছে কখন জুম্পা লাহিড়ি আসবেন। ৭টায় জুম্পা লাহিড়ি লাইব্রেরিতে আসবেন। ৭টা বাজতে এখনো ১০ মিনিট বাকি আছে। জেনিফারের মধ্যে এক ধরনের আনন্দের উত্তেজনা কাজ করছে। অলক জেনিফারের উদ্দেশে মনে মনে বলল,
‘বাসর রাতে জুম্পা লাহিড়ির ‘ইন্টারপ্রেটার অব মেলোডিজ’ উপন্যাসটি তোমাকে পাঠ করে শোনাব। এরপর থেকে প্রতি সপ্তাহে শনি অথবা রোববার অন্তত একটি বই তোমাকে পাঠ করে শোনাব, সুইট হার্ট। বছরে ৫২টা বই!’
রোমানকে দেখে ভুত দেখার মতো চমকে উঠল এলিনা। চমকে ওঠারই কথা। ও কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলতে পারল না। এলিনা কফি কিনছিল। পাশ থেকে রোমান বলল,
‘দুটো কফি নিয়ো, এলিনা। আমিও আছি।’
এলিনা ঘাড় ঘুরিয়ে রোমানকে দেখে চমকে গেল। রোমানও এলিনাকে চমকে দিতে চেয়েছিল। এলিনার চোখ দেখে ওর মনে হলো, ও এলিনাকে চমকে দিতে পেরেছে। লাইব্রেরিতে জুম্পা লাহিড়ি নিয়ে অনুষ্ঠান চলাকালে সবার পেছনে চুপ করে বসেছিল ও। জুম্পা লাহিড়ি নিজের বইয়ের একটি অংশ পাঠ করেছেন। এরপর উপস্থিত শ্রোতা ও পাঠকের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন তিনি। ১ ঘণ্টার অনুষ্ঠান। পুরো ১ ঘণ্টা রোমান চুপ ছিল। অনুষ্ঠান শেষে এলিনার সঙ্গে আসা যুবক এলিনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। হয়তো যুবকটির কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। যুবকটি চলে যাওয়ায় রোমানের অস্বস্তিও কমে গেল। ওর মনে হলো আজ ওর ভাগ্য সুপ্রসন্ন। এলিনা লাইব্রেরির কফিশপে গিয়ে কফি কেনার সময় ও নিজের উপস্থিতি জানান দিলো। এলিনার মুখে কথা সরছিল না। ও বলল,
‘খুব কি চমকে গেছ?’
এলিনা ধাতস্ত হয়ে আসছে। ও বলল,

‘রো-মা-ন!’
‘লাইনে আরো লোক আছে। তাড়াতাড়ি দুটো কফি নাও।’
‘ও, আচ্ছা।’
বলে এলিনা দুটো কফি নিলো। ও ঘুরে দাঁড়িয়ে রোমানের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হেসে বলল,
‘কোথায় বসবে?’
‘একটু নিরিবিলিতে বসতে চাই। তোমার কি সময় হবে?’
‘কেন?’
‘তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।’
এ কথার জবাবে এলিনা মুখ টিপে হাসলো। যেন রোমান কী বলতে চায়, ও তা জানে। একটা টেবিল দেখে ওরা মুখোমুখি বসল। রোমান লক্ষ্য করল অলক ও জেনিফার একটু দূরে আরেক টেবিলে বসে আছে। অলক বারবার মুখ ঘুরিয়ে ওদের দেখছে। ‘শালা, বদমাইস!’ অলকের উদ্দেশে মনে মনে গাল দিলো রোমান। এলিনা কফির কাপে চুমুক দিয়ে রোমানের উদ্দেশে বলল,
‘তোমার সঙ্গে এখানে দেখা হবে, ভাবতেই পারিনি!’
‘হুম্। আমিও ভাবিনি, এখানে তোমার সঙ্গে হবে। তাও আবার বয়ফ্রেন্ডসহ!’
এ কথায় খিলখিলিয়ে হেসে উঠল এলিনা। হাসির শব্দ যাতে বেশি জোরে না হয়, এর জন্য মুখে হাত চাপা দিলো। হাসির দমকে দমকে এলিনার শরীর কাঁপছে। রোমান বলল,
‘হাসছো কেনো? আমি কি হাসির কিছু বলেছি?’
এলিনা নিজের হাসি সংযত করল। ও রোমানের চোখে চোখ রেখে বলল,
‘যাকে দেখেছ, সে এখনো আমার বয়ফ্রেন্ড হয়নি।’
‘যেমন?’
‘যেমন অনেকটা তোমার মতো। প্রপোজ করেছে মাত্র।’
‘ওহ্! তোমার সিদ্ধান্তের টেবিলে কতজনের প্রপোজ পড়ে আছে?’
এ কথায় ফের হাসলো এলিনা। রোমানের বুকের ভেতর ভেঙেচুড়ে যাচ্ছে। এলিনার হাসির মাদকতায় ও কেমন মন্ত্রমুগ্ধও হয়ে যাচ্ছে। সে সঙ্গে ‘আই লাভ ইউ’ বলার লজ্জা এবং এর কোনো জবাব না পাওয়ার অপমান ওকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। ও বলল,
‘আজ শুধু তোমার হাসির মাধুর্যের কাছে হেরে যেতে চাই না, এলিনা।’
‘তাই না কি? আমার হাসিতে আবার মাধুর্যতা আছে না কি?’
‘এলিনা, তুমি নিজেও জানো, তোমার হাসির সামনে আমরা কত অসহায়!’
‘আমরা মানে?’
‘আমরা মানে হচ্ছে, আমার মতো যারা তোমার মজনু, তারা।’
এলিনা মিষ্টি করে হাসলো। ও কিছু বলতে যাচ্ছিল, রোমান বলল,
‘একটা কথা বলতে চাই।’
এলিনা চোখের ভ্রু নাচিয়ে বলল,
‘বলো। কী বলতে চাও, বলে ফেলো।’
এ কথায় রোমান মনে মনে বলল ‘যা বলতে চাই, সেটা তো বলেই ফেলেছি। তুমি তো এর কোনো জবাব দাওনি। আজ আর নতুন কী বলব। ‘আই লাভ ইউ’ বলার চেয়ে পৃথিবীর আর কি কোনো শ্রেষ্ঠ কথা আছে?’ ও মুখে বলল,
‘কথাটি বলার আগে একটা প্রশ্ন আছে।’
‘প্রশ্ন করো।’
একটু সংকোচ বোধ করলেও প্রশ্নটা করল রোমান।
‘তুমি তো অনেকের প্রপোজাল পেয়েছ। কাউকে কি কথা দিয়ে ফেলেছ? আই মিন, রেসপন্স করেছ।’
‘কেন?’
হেসে জানতে চাইলো এলিনা। রোমান বলল,
‘প্রশ্ন করবে না, জবাব দাও। কাউকে রেসপন্স করেছ কি না?’

‘এখনো করিনি। কেন?’
‘আজকে যাকে দেখলাম, তাকেও না?’
‘না। সে সম্ভবত আজ আমাকে প্রপোজ করত। কী এক জরুরি ফোন পেয়ে সে চলো গেলো। বেচারা!’
এলিনার মুখে একটা হাসির দ্যুতি ঝলমল করছে। এই হাসির দ্যুতিতে একতাল রহস্যও যেন জমে আছে। রোমান একটু গম্ভীর হয়ে গেল। ও কী বলবে, তা ঠিক করছে। ওর নিজের ভেতরে নিজেকে প্রস্তুত করছে। এলিনা ওর জড়তা কমিয়ে দিতেই যেন বলল,
‘রোমান, তুমি একবার আমাকে তোমার মনের কথাটি বলেছ। আজ আর নতুন করে কী বলবে, জানি না। তুমি যা বলেছিলে, এর সঙ্গে কী নতুন কিছু যোগ করতে চাও।’
রোমান কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো এলিনার মুখের দিকে। এলিনা ওর চোখের দৃষ্টি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলো না। এলিনা জবাব আশা করছে। গুমোট বেদনা মিশ্রিত জড়তা ভেঙে রোমান বলল,
‘এলিনা, তোমার জীবনসঙ্গী হওয়ার যোগ্যতা হয়তো আমার নেই। তোমাকে বিয়ে করাটা কেবল স্বপ্নের প্রিয় বিষয় হতে পারে। তোমার সঙ্গে এই যে কফি পান করছি, কথা বলছি- এ মুহূর্তগুলো হয়তো জীবনের সবচেয়ে আনন্দের ঘটনা।’
‘রোমান, তুমি কী সব বলছ...!’
‘লেট মি সে, এলিনা। আমি যা বলতে পারি না, অথচ বলতে না পারার কষ্ট নিয়ে কথা বলি। লেট মি সে!’
‘ওকে, গো এহেড!’
‘আমি জানি, সেদিন ভীষণ আবেগপ্রবণ হয়ে নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি। তুমি কি আমার কথায় রাগ করেছিলে?’
এই প্রশ্নের জবাব দিতে কয়েক মুহূর্ত ভাবলো এলিনা। এপর বলল,
‘না, রাগ করিনি। আমার প্রতি তোমার বিশেষ দুর্বলতা যে আছে, সেটা আমি জানতাম। তুমি সেদিন দুর্বলতার কথাটা বলে ফেলেছ।’
‘এরপর থেকে তুমি আর কখনো আমাকে ফোন করোনি।’
‘হুম্। বিশেষ দুর্বলতার কথা জানার পর সম্পর্ক স্বাভাবিক থাকে না। এরপর সম্পর্ক রাখলে সেটা দুর্বলতার স্বীকৃতি পেয়ে যায়। আমি তো সে অবস্থায় নেই, রোমান।’
‘আমি জানি, তোমার স্বীকৃতি পাবার যোগ্যতা আমার নেই।’
‘যোগ্যতার বিবেচনা তো আমি করিনি!’
‘তাহলে?’
‘আমি বিবেচনা করেছি, নিজেকে নিয়ে। আমার জীবনের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে আমি কাউকে জড়াতে চাই না। আমি একা এগুতে চাই, রোমান।’
কথাগুলো বলতে গিয়ে এলিনার কণ্ঠ কেমন জমে যাচ্ছিল। রোমানের চোখ ছলছল করে উঠছে। এলিনার কথাগুলো কেমন বিষণ্ন কবিতার মতো লাগছে। ওর ভেতরে চেপে থাকা পাথর গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে। এলিনা ওকে উপেক্ষা বা তাচ্ছিল্য করেনি, এটা ভেবে ওর মনটা ভরে গেল। ও বলল,
‘আমি কি তোমার জীবনসঙ্গী হতে পারি না? তোমাকে বলে রাখছি, আমি এই সেমিস্টারে কলেজে ভর্তি হয়ে যাচ্ছি। এখানে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করতে চাই। আমি তোমার যোগ্য হতে চাই।’
রোমানের কথায় স্মিত হাসলো এলিনা। ও বলল,
‘রোমান, আমার যে বড় এক অযোগ্যতা আছে, সেটা তো জানো।’
‘তোমার আবার অযোগ্যতা কি?’
‘আমি একজনকে বিয়ে করেছিলাম।’
‘শুধু এটাই?’
‘দ্বিতীয় অযোগ্যতা হচ্ছে আমি নাইটক্লাবের ড্যান্সার!’
এ কথায় হো হো করে হেসে ফেলল রোমান। এলিনা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। রোমানের হাসি থামার পর কপট বিস্ময় চোখে মুখে ফুটিয়ে এলিনা বলল,
‘আমার অযোগ্যতা কি তোমার কাছে একেবারেই বিবেচনার বিষয় নয়?’
‘না। আমার কাছে তুমি হচ্ছো চাঁদ, আর ওই তোমার কথিত অযোগ্যতা হচ্ছে চাঁদের কলঙ্ক।’
‘হুম্, বুঝতে পারছি তুমি অন্ধ হয়ে গেছ।’

এলিনার কথায় রোমান ওর দু'হাত বাড়িয়ে এলিনার দু'হাতের কবজি মুঠোবন্দি করল। এলিনা ওকে বাধা দিলো না। এলিনার দু'হাত মুঠোবন্দি করে রোমান বলল,
'আমি বাকি জীবন তোমার প্রেমে অন্ধ থাকতে চাই। অন্ধ থাকতে দেবে?'
রোমানের কথায় কেমন শিহরণ অনুভব করল এলিনা। ওর বুকের ভেতরটা কাঁপছে। ও রোমানের দিকে তাকাতে পারছে না। ও চোখ নামিয়ে নিলো। দৃষ্টি সরিয়ে নেয়া যে নিজেকে সরিয়ে নেয়া নয়, এটা বুঝতে পারছে রোমান। ওর ভেতরে তোলপাড় চলছে। এ মুহূর্তে এলিনা কিছু বলুক, আর না বলুক এলিনার হাত দুটি যে ওর মুঠোবন্দি হয়ে আছে এটাই অনেক বড় প্রাপ্তি। ও এলিনার হাতের কবজি আরো শক্ত করে ধরল। এলিনা ওর হাত সরিয়ে নিলো না। হঠাৎ ঝড়ো হাওয়ায় যেমন অকারণে ফুলের পাপড়ি ঝরে পড়ে, তেমনি এলিনার দু'চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা অশ্রু হঠাৎ গড়িয়ে পড়ল। অশ্রুর ফোঁটা পড়ল রোমানের হাতের ওপর। অদ্ভুত শিহরণে কেঁপে উঠল রোমান। ওর মনে হলো, এলিনার অশ্রুজলে ও পবিত্র হয়ে গেল। রোমান কিছু বলতে যাচ্ছিল, এ সময় ক্যামেরার ফ্লাশলাইট জ্বলে উঠল। রোমান তাকিয়ে দেখলো অলক ওদের ছবি তুলছে। রোমানকে অলক ও জেনিফার একসঙ্গে বলে উঠল,
'কংগ্রেচুলেশন, রোমান অ্যান্ড এলিনা!'
রোমান হেসে ফেলল। এলিনা কিছু না বুঝতে পেরে ভ্যাবাচেখা খেয়ে গেল। রোমান লজ্জা পেয়ে এলিনার হাত ছেড়ে দিলো। অলক রোমানকে বলল,
'ভালোবাসা নিবেদন এবং গ্রহণের মুহূর্তকে ক্যামেরাবন্দি কলে ফেললাম, বন্ধু। আমরা লাইব্রেরির বাইরে যাচ্ছি। তোমরাও আসো। রিয়াজও আসছে।'
'মানে?'
'মানে আমি ওকে ফোন করে জানিয়েছি, তুমি হাঁদারাম প্রেম করছ। ও আসছে। আজ আমরা সেলিব্রেট করব।'
'হোয়াট?'
এ কথার জবাব না দিয়ে অলক ও জেনিফার লাইব্রেরি থেকে বের হয়ে গেল। রোমান লাজুক ও বিব্রত হলো। এলিনা বলল,
'আমি ঠিক বুজতে পারছি না। ওরা কারা?'
'অলক আমার বন্ধু। ওর সঙ্গেই এখানে এসেছিলাম। ও তোমার কথা জানত। কখনো তোমাকে দেখেনি। ও ধরে নিয়েছে, তোমার সঙ্গে আমার প্রেম হয়ে গেছে।'
'ও আচ্ছা!'
বিব্রতকণ্ঠে ছোট্ট করে জবাব দিল এলিনা। রোমান বলল,
'এখন কী করব?'
'কি?'
'এই যে অলক বলে গেল যে সেলিব্রেট করবে!'
এ কথায় হেসে ফেলল এলিনা। রোমান অসহায় চোখে তাকিয়ে আছে এলিনার দিকে। এলিনার হাসি থামার পর বলল,
'লেটস সেলিব্রেট!'
'রিয়েলি!'
'হোয়াই নট? লেটস গো!'
উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল এলিনা। এলিনার কথায় তুমুল এক ঢেউ উঠল ওর বুকে। ও কি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে? এলিনার এই সম্মতি রোমানের পৃথিবী বদলে দিলো। এলিনাকে ও পাবে কি, পাবে না, ও জানে না। কিন্তু এ মুহূর্তে এলিনা ওর।

নয়

ঢাকায় ফিরে প্রপা রিয়াজকে ফোন করবে না- এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। অথচ ৭ দিন পেরিয়ে গেল প্রপার ফোন আসেনি। প্রপা ওদের বাসার ফোন নম্বর রিয়াজকে দিয়ে গিয়েছিল, ওই নম্বরে ও ফোন করেছে অনেকবার। ফোন বাজে, কেউ ধরে না। প্রপার আচরণে রিয়াজ এতটাই বিস্মিত হয়েছে যে, ও প্রপার কথা ভাবলেই স্তম্ভিত হয়ে যায়। মন বেদনা বিধুর হয়ে থাকে। অনেক রকম প্রশ্ন ওকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। প্রপা কি রাগ করেছে বা অভিমান? রাগ বা অভিমান করে থাকলে কেন করবে? এ প্রশ্নটাই বেশি ওর মনে জাগছে। প্রপার আচরণে রিয়াজ যেন এক গোলক ধাঁধাঁয় পড়ে গেছে। ও

গোলক ধাঁধাঁয় ঘুরপাক খাচ্ছে কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারছে না। এই প্রথম প্রপার সঙ্গে ওর একটা সংকট তৈরি হলো। প্রপা ঢাকায় যাবার পর থেকেই রিয়াজের টেনশন বেড়েছে। ঢাকায় ঠিকমতো পৌঁছুল কি না, এ খবরটি ওকে জানানো উচিত ছিল। 'প্রপার বাবার কি কিছু হলো? তিনি কি বেঁচে আছেন?' প্রশ্ন দুটো রিয়াজকে খুঁচিয়ে যাচ্ছে। রিয়াজ এ ক'দিন ঘুমাতে পারেনি। কাজে মন বসাতে পারেনি। ওর কোনো কিছুই ভালো লাগছে না। প্রপার এমন আচরণে ভীষণ হতবাক রিয়াজ। গত ৭ দিনে ও কেমন উদভ্রান্ত হয়ে গেছে। ওর বুকের ভেতর এক অজানা কষ্ট দুমরে-মুচরে উঠছে। এমন কখনো হয়নি ওর। মানুষের জীবনে এমন কিছু কিছু মুহূর্ত আসে যে, মুহূর্তগুলো মোকাবেলা করতে ধৈর্যশক্তি থাকে না। অসহনীয় যন্ত্রণা সে ছটফট করে। রিয়াজ যেন সে ওই রকম সময়কে মোকাবেলা করছে। ৭ দিনে ওর মন বিষিয়ে উঠেছে। প্রপার কোনো খোঁজ না পাবার কারণে ও ঢাকায় যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলো। ১১ বছর ও দেশে যায়নি। আসলে যায়নি বললে ঠিক হবে না, ও যেতে পারেনি। স্টুডেন্ট ভিসায় নিউইয়র্ক ও পড়তে এসেছিল। প্রথমে ভর্তি হয়েছিল আইটিতে। টিউশন ফি যোগাতে পারেনি। শেষে নেটওয়ার্কিংয়ে গ্র্যাজুয়েশন করেছে ও। এরপর স্বপ্নের দেশ আমেরিকায় বৈধ অভিবাসী হবার অনেক চেষ্টাই করেছে। অধরাই থেকে গেছে বৈধ অভিবাসী হবার স্বপ্ন। দেশে যাবার আর সুযোগ হয়নি ওর।

মনের দুর্বল অবস্থার কারণে প্রপার সঙ্গে ওর পরিচয়ের ঘটনা এবং প্রেম করার সময়ে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো এখন ওর মনের পর্দায় বারবার ভেসে উঠছে। রিয়াজ সচেতনভাবে এসব ঘটনা ভাবতে চাইছে না। কিন্তু ওর অবচেতন মন ওই ঘটনা টেনে আনছে স্মৃতির সেলুলয়েডের ফিতায়। আজ ঘুম থেকে ওঠার পরই ওর মনে ভেসে উঠল কিভাবে প্রপার সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছিল, সে ঘটনার কথা। প্রপার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ফেইসবুকে। অন্য সবার মতো রিয়াজও প্রপার বন্ধু হয়েছিল। প্রথমে ফেইসবুকে মাঝে মধ্যে মন্তব্য করা ছাড়া ওদের মধ্যে কখনো চ্যাটিংয়ে কথা হয়নি। ওরা একে-অন্যকে ভালো করে চিনতও না। একটি ঘটনা ওদের মধ্যে পরিচয়ের নতুন এক সেতুবন্ধন তৈরি করে। প্রপা ওর খালা-খালুর সঙ্গে একদিন নিউইয়র্ক এলো। নিউইয়র্ক শহরের কুইন্সে এসে প্রবল তুষারপাতে রাস্তায় বিপদে পড়ে গিয়েছিল তারা। সেদিন এত তুষারপাত হয়েছিলো যে, নিউইয়র্ক শহরের জনজীবন অচল হয়ে পড়েছিল। রাস্তাগুলো ১২ ইঞ্চি পুরো বরফে ঢেকে গিয়েছিল। শহরের বাড়িগুলো বরফে ঢেকে যাওয়ায় সাদা ভূতুরে বাড়ির মতো লাগছিল। প্রবল তুষারপাতের কারণে সিটি কর্তৃপক্ষ এদিন দুর্যোগ ঘোষণা করে জরুরি কাজ না থাকলে নাগরিকদের নিজ নিজ বাড়ি থেকে বের না হতে অনুরোধ করল। এদিন বিকেলটা ঝুপ করে সন্ধ্যা কোলে ডুবে গেল। তুষারপাতের দিন সব সময় ছোট হয়ে যায় এবং রাত হয় দীর্ঘ। এমন দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় যারা রাস্তায় গাড়ি চালান তাদের কেউ কেউ আটকে যান রাস্তার ওপর। এমন দৃশ্য প্রায় সব রাস্তায় দেখা যায়। প্রপাদের গাড়িও আটকে গিয়েছিল জ্যাকসন হাইটসে। দুর্যোগের সময় বেলচা নিয়ে কেউ কেউ বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়। তারা বরফ কেটে আটকেপড়া গাড়ি চলার সুযোগ করে দেন। বিপদগ্রস্তরা খুশি হয়ে মোটা অংকের বকশিস দেন। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বেলচা দিয়ে বরফ কাটা সহজ কাজ নয়। যারা সাহস করে বের হয়ে এ কাজ করেন, তাদের ভালো আয় হয়। প্রপাদের গাড়ি আটকে গিয়েছিল নির্জন এলাকায় ৩৪ এভিনিউর ওপর ৬২ স্ট্রিটের কর্ণারে। এখানে ওরা প্রায় একঘন্টা অপেক্ষা করেও কাউকে দেখতে পেল না। 'গাড়িটা রাস্তার ওপর ফেলে রেখে চলে যাবে'- যখন এমন কথা ভাবছিলেন প্রপার খালু মোজাম্মেল হক, তখন ব্রডওয়ে থেকে ৬২ স্ট্রিট দিয়ে বেলচা হাতে এগিয়ে এলো রিয়াজ। প্রপার কাছে মনে হলো দেবদূত এগিয়ে আসছে। রিয়াজ ওদের গাড়ির সামনে এসে বলল,

'ডু ইউ নিড হেল্প, স্যার?'

রিয়াজকে দেখে বাংলাদেশী যুবক বলে মনে হলো মোজাম্মেল হকের। তিনি আনন্দের অতিশয্যে বাংলায় বলে উঠলেন,

'বাবা, আমরা ১ ঘণ্টা ধরে আটকে আছি। আমাদের সাহায্য করো।'

তুমি সংবধন করে বললেন তিনি। বাংলা কথা শুনে রিয়াজ বিগলিত হয়ে গেল। ও বেলচা দিয়ে গাড়ির চাকার সামনের বরফ কেটে সরাতে লাগলো। সিক্স সিলিন্ডারের ফোর্ড কোম্পনির মিনিভ্যান বরফে আটকে গেছে। ফোর হুইল গাড়ি হলে হয়তো আটকাতো না। বরফ কেটে পরিষ্কার করতে গিয়ে ভাবল রিয়াজ। বরফ পরিষ্কার করার কাজের মধ্যে ও মোজাম্মেল হকের উদ্দেশে বলল,

'স্যার, আপনারা কোথায় যাবেন?'

'এলমার্স্টে যাব। আমার বন্ধুর বাড়িতে।'

বললেন মোজাম্মেল হক। রিয়াজ বলল,

'তাহলে আপনি সিক্সটি ওয়ান স্ট্রিটে রাইট টার্ন করে ব্রডওয়ে ধরে এগুবেন। হয়তো যেতে পারবেন। অন্য রাস্তা ধরলে কিন্তু আবারো আটকে যেতে পারেন।'

‘ধন্যবাদ, তোমাকে। আমরা এসেছি বস্টন থেকে। বুঝতে পারিনি কোন রাস্তায় গেলে ভালো হতো। এখানে এসে সেই কখন থেকে আটকে রয়েছি।’
মোজাম্মেল হকের এ কথার জবাবে আর কিছু বলল না রিয়াজ। ও বরফ পরিষ্কার করতে লাগল। মোজোম্মেল হক গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসেছিলেন। পাশের সিটে তার স্ত্রী। পেছনের সিটে প্রপা বসেছিল। বরফ পরিষ্কার করে রিয়াজ মোজাম্মেল হকের জানালার কাছে এসে বলল,
‘এবার যেতে পারবেন। আবারো বলছি, ব্রডওয়ে ধরে যাবেন।’
মোজাম্মেল হক ভীষণ খুশি হলেন। তিনি বললেন,
‘তোমাকে কত দিতে হবে? তুমি যা চাইবে, আমি তাই দেব। ওহ্, কী বিপদেই না পড়েছিলাম!‘
মোজাম্মেল হককে অবাক করে দিয়ে রিয়াজ বলল,
‘আমি কোনো অর্থ নেই না। আমি বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করতে বরফ কেটে দিচ্ছি। সুতরাং আমাকে কোন অর্থ দিতে হবে না।’
মোজাম্মেল হক কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারলেন না। এমন দুর্যোগে কেউ কেউ সহযোগিতা করেন ঠিক, তবে বাংলাদেশী কাউকে এ রকম স্বেচ্ছাশ্রম দিতে তিনি দেখেননি। মোজাম্মেল হক অভিভূত হয়ে গেলেন। রিয়াজ আর কিছু না বলে হাঁটতে লাগলো নর্দান ব্লুভার্ডের দিকে। মোজাম্মেল হক ওর পেছনে চিৎকার করে বললেন,
‘তোমার নাম কি বাবা?’
রিয়াজ এর জবাব না দিয়ে পেছনে ঘুরে হাত নেড়ে বিদায় জানালো। বলল,
‘সাবধানে যাবেন।’
মোজাম্মেল হক বললেন,
‘তোমার কথা ভুলব না আমরা।’
রিয়াজ আর পেছনে তাকালো না। ও হাঁটতে লাগল। ও মোজাম্মেল হককে অভিভূত করার জন্য এ কাজ করেনি। ওর নিজের ভালো লাগে বলে এমন দুর্যোগের সময় বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করতে ও বেরিয়ে পড়ে। এদিন রিয়াজ গাড়ির পেছনের সিটে বসে থাকা প্রপাকে লক্ষ্য করেনি। অন্ধকার ছিল বলে গাড়ির পেছনের সিটে চুপ করে বসে থাকা একটি মেয়ের অস্তিত্ব ও টের পায়নি। প্রপা কখন যে সেলফোনের ক্যামেরা দিয়ে ওর ছবি তুলেছে, সেটাও টের পায়নি। পরেরদিন ফেইসবুকে প্রপা ওর ছবিটা ছেড়ে দিলো ‘সাডেনলি এঞ্জেল’ শিরোনাম দিয়ে। প্রপা সংক্ষেপে বরফে আটকেপড়া এবং আটকে পড়া থেকে কিভাবে উদ্ধার হলো তা লিখে দিলো। ফেইসবুক বন্ধু হিসেবে রিয়াজও পেল ওর ছবি এবং প্রপার কথা। ও যেমন ভীষণ চমকে গেল, তেমনি লজ্জার মধ্যেও পড়লো। ও প্রপাকে ওর ম্যাসেজ বক্সে চিঠি লিখল ছবিটা ফেইসবুক থেকে প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য। প্রপাও অবাক হলো জেনে যে, রিয়াজ ওর ফেইসবুক বন্ধু। রিয়াজের কয়েক দফা অনুরোধে প্রপা অবশেষে ফেইসবুক থেকে রিয়াজের ছবিটা ডিলেইট করে দিল। সেদিন থেকে প্রপার সঙ্গে রিয়াজের ব্যক্তিগত পর্যায়ের বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। তারা চ্যাটিং করত নিয়মিত। ধীরে ধীরে ওদের বন্ধুত্বে খুব দ্রুত প্রেম পেখম ছড়াল। এরপর থেকে ওদের প্রেম গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। একে অন্যকে জানার মধ্য দিয়ে জীবন পথে যুগলযাত্রার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে দু’জনে। প্রপার কাছে রিয়াজ স্ফটিক জলের মতো পরিষ্কার, রিয়াজের কাছেও প্রপা তেমনি। ওদের মধ্যে কোনো ভুল বোঝাবুঝি হয়নি, দ্বিধা বা অভিমান জন্ম নেয়নি। এই প্রথমবারের মতো প্রপার আচরণে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। রিয়াজকে করেছে ব্যাকুল, উদগ্রীব ও অস্থির। এ অস্থিরতার মধ্যে ও দেশে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। রিয়াজ জানে, ঢাকায় গেলে ও হয়তো আর যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসতে পারবে না। ওসব নিয়ে ভাবতে চায় না ও। কী হবে ভেবে? যার জন্য এই দেশে থাকতে চায় ও, তারই কোনো হদিস পাচ্ছে না। প্রপার জন্য হলেও তো ওকে যেতে হবে। রিয়াজ এয়ারলাইন্সের টিকিট কেটে কাল রাতে ফোন করে অলক ও রোমানকে বলেছিল, ‘সকালে বাসায়, তোদের সঙ্গে জরুরি মিটিং আছে’। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে ও অলক ও রোমানকে ডেকেছে। রিয়াজ ওদের লিভিং রুমে বসে আছে অনেকক্ষণ যাবত। বসে প্রপার কথাই ভাবছিল। রোমান ঘুমিয়েছিল, ও ঘুম উঠে এলো ঢুলু ঢুলু চোখে। অলক সকালেই ঘুম থেকে ওঠে। ও পরিপাটি হয়ে চলে এলো ওর রুম থেকে।
সোফায় বসতে গিয়ে রিয়াজকে অলক বলল,
‘বন্ধু, কী খবর? প্রপা কি এখনো ফোন করেনি?’
এ প্রশ্নটার জবাব প্রতিদিন ওদের দিতে হচ্ছে রিয়াজের। ও মুখ শুকনো করে বলল,
‘না। আজো ওর ফোন পাইনি।’

রোমান বসলো অলকের পাশে। ও বলল,
‘প্রপা তো এমন করার কথা নয়? ওর বাবার খবর কি? তার কিছু হয়নি তো?’
রিয়াজ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। ও বলল,
‘আমি আর কিছুই ভাবতে পারছি না। কী হয়েছে আমি কী করে বলব?’
অলক বলল,
‘তুই ওর খালা-খালুর বাসায় ফোন করেছিস? ওর বান্ধবীর বাসায়?’
রিয়াজ বলল,
‘ওর খালার বাসায় প্রতিদিন ফোন করছি। ম্যাসেজ রাখছি। কোনো কলব্যাক নেই। এখন তো ম্যাসেজও ফুল হয়ে গেছে।’
‘তারাও কি বাংলাদেশে গিয়েছেন?’
জানতে চাইলো রোমান। রিয়াজ বলল,
‘কী জানি। যেতেও পারেন।’
‘আর লং আইল্যান্ডে যে বান্ধবী থাকে, কী যেন নাম লুবনা...! না?’
জানতে চাইলো রোমান। রিয়াজ এবার ছোট্ট করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। ও বলল,
‘লুবনাকেও ফোন করেছি। ও বলেছে, প্রপা নাকি ওকেও ফোন করেনি। প্রপার আচরণে লুবনাও বিস্মিত।’
‘বলিস কি? ব্যাপারটা কেমন সিলি হয়ে গেল না?’
বলল অলক। রিয়াজ মাথা নেড়ে সম্পতি প্রকাশ করল। রোমান বলল,
‘তো এখন কী করবি? জরুরি মিটিং ডেকেছিস কেন?’
রিয়াজ বলল,
‘আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাই তোদের ডেকেছি। তোরা দু’জন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তোদের সঙ্গে আমার সিদ্ধান্তটা শেয়ার করতে চাই।’
‘অবশ্যই শেয়ার করবি। তো বল, কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিস?’
জানতে চাইলো অলক। রোমানের ঘুম ঢুলু চোখও প্রশ্নবোধক হয়ে তাকিয়ে আছে রিয়জের মুখের দিকে। রিয়াজ একটু চুপ করে দম নিলো যেন। এরপর ও দু’বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল,
‘আমি বাংলাদেশে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
‘কী বললি?’
অলক ও রোমান সমস্বরে চিৎকার করে উঠল। রিয়াজের কথায় ওদের যেন বজ্রপাত হলো। রিয়াজ দু’বন্ধুর আর্তকণ্ঠকে উপেক্ষা করে বলল,
‘আমি অনেক ভেবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বন্ধু। যদি প্রপার কোনো বিপদ হয়ে থাকে। কে জানে, কী হয়েছে। আমি আর এখানে বসে থাকতে পারি না। প্রপার জন্যই আমি বাংলাদেশে যাব।’
রিয়াজের কথার পর অলক ও রোমান কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। ওরা রিয়াজের সিদ্ধান্তের কথায় হঠাৎ চুপসে গেছে। রিয়াজ ফের বলল,
‘আমি জানি, আমি হয়তো আর এই দেশে ফিরে আসতে পারব না। কিন্তু আমার আর কোনো চয়েজ নেই।’
এ কথা বলার সময় রিয়াজের কণ্ঠ কেঁপে উঠল। ওর বুকের ভেতরে হু হু কান্না উথলে উঠল লাগল। ও নিজেকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করল। অলক ও রোমানের চোখে-মুখেও বিষণ্নতা নেমে এসেছে। ওরা যেন ভারি তুষারপাতে ঢেকে যাচ্ছে। অলক বিষণ্ন কণ্ঠে বলল,
‘বন্ধু, তুই কী বলছিস? আমার মাথা ঘুরছে। তুই বাংলাদেশে কেন যাবি?’
‘আগেই তো বললাম, আমার আর কোনো চয়েজ নেই। আমি এখানে বসে কী করবো? প্রপার নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা হয়েছে। নইলে ও আমাকে ফোন তো করত।’
বলল রিয়াজ। অলক বলল,
‘কী সমস্যা হতে পারে? আর তুই গিয়ে কি ওই সমস্যার সমাধান করতে পারবি?’
‘সমস্যার সমাধান করতে পারা বা না পারার বিষয় নয়। বিষয় হচ্ছে বিপদের সময় প্রপার পাশে দাঁড়ানোর।’
‘কিন্তু প্রপার পাশে দাঁড়াতে গিয়ে নিজের কী ক্ষতি হবে, তা ভেবেছিস?’
প্রশ্ন করল রোমান। রিয়াজ বলল,

‘অনেক ভেবেই তো সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জানি, হয়তো আর ফিরে আসতে পারব না এই দেশে।’
‘তাহলে? তারপরও বাংলাদেশে যাবি?’
বলল অলক। রিয়াজ ম্লান হেসে বলল,
‘আমি যাব। প্রপাকে নিয়ে বাংলাদেশেই সংসার শুরু করব। কী বলিস?’
‘এরপর?’
রোমানের প্রশ্ন। রিয়াজ বলল,
‘এরপর কী হবে, তা নিয়ে ভাবতে চাই না। যা হবার হবে।’
অলক রিয়াজের কাছে প্রশ্ন করল,
‘আচ্ছা, প্রপা যেদিন ঢাকায় যায়, সেদিন তো শায়লা নামের মেয়েটিও ঢাকায় গিয়েছে, তাই না?’
‘হুম।’
বলল রিয়াজ। অলক বলল,
‘এয়ারপোর্টে দেখলাম, তুই প্রপার সঙ্গে শায়লাকে পরিচয় করিয়ে দিলি।’
‘হ্যাঁ, দিয়েছি। একই ফ্লাইটে যাচ্ছে। পরিচয় করিয়ে দিলাম। দীর্ঘ যাত্রাপথে গল্প করে ওরা সময় কাটাতে পারবে।’
বলল রিয়াজ। চোখে মুখে ঘোরতর সন্দেহ ফুটে উঠল অলকের। ও বলল,
‘বন্ধু, এমন তো হতে পারে, শায়লা এমন কিছু বলেছে যে, প্রপা তোর প্রতি রেগে আছে।’
‘কেন? আমি তো এমন কিছু করিনি। তাছাড়া শায়লার সঙ্গে তো আমার তেমন কোনো সম্পর্ক নয়।’
বলল রিয়াজ। রোমান বলল,
‘শায়লার প্রতি তোর হয়তো দুর্বলতা নেই, তোর প্রতি শায়লার কি দুর্বলতা নেই?’
রোমানের কথায় একটু দ্বন্দ্বে পড়ে গেল রিয়াজ। ও এভাবে ভাবেনি। হতে পারে শায়লা এমন কিছু বলেছে যে প্রপা রাগ করতে পারে। কিন্তু একজনের কথা শুনে শায়লা কেন রাগ করবে এবং ঢাকায় ফিরে একবারও রিয়াজকে ফোন করবে না কেন? প্রপা এমন নয়। ও কোনোকিছু চেপে রাখে না। সরাসরি কথা বলে ফেলে। রাখঢাক করে পেটে কথা ধরে রাখে না। মনে মনে এ কথাগুলো ভাবলো রিয়াজ। এরপর ও বলল,
‘আমার মনে হয় না, সে রকম কিছু। প্রপা রাগ করলেও রাগ প্রকাশ করে। যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়াটা ওর রাগ বলে ধরে নিতে পারছি না। আমার মন বলছে, ওর কোনো সমস্যা হয়েছে।’
রিয়াজের কথার সঙ্গে তর্ক করে কোনো লাভ হবে না- ভাবলো অলক। প্রপা ওর চিন্ত-চেতনায় এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে, ওর জন্য বাংলাদেশ কেনো, নির্জন দ্বীপে নির্বাসনেও যেতে রাজি হবে। তাই হাল ছেড়ে দেয়ার মতো করে অলক বলল,
‘তা কবে যাচ্ছিস বাংলাদেশে?’
‘আজই। রাতের ফ্লাইটে।’
বলল রিয়াজ। ওর কথায় অলক ও রোমান আকাশ থেকে মাটিতে পড়ল যেন। ওদের দৃষ্টিতে ফের বিস্ময় ফুটে উঠল। কী বলবে ওরা বুঝে উঠতে পারল না। রোমান অস্ফূট স্বরে বলল,
‘কী বলছিস, তুই!’
‘ঠিক-ই বলছি, বন্ধু। আমি কাল এয়ার টিকিট কেটে ফেলেছি।’
বলল রিয়াজ। অলক বলল,
‘একা একা এসব করলি। আমাদের বললি আজ সকালে?’
‘কী করব বল, আমার মনের অবস্থা ভালো নেই। তোদের কষ্ট দিতে চাইনি।’
রিয়াজের কথায় অলকের মুখে একটা খারাপ গালি চলে এসেছিল। ও গালিটা দিলো না। আজ ও চলে যচ্ছে, যাবার দিন ওকে গালি দিতে মন সায় দিলো না। অন্যদিন হলে ও খারাপ গালিটা দিয়ে ফেলতো। অলক বলল,
‘দেশে যাবিই যখন, আদালত থেকে একটা দেশে যাবার পারমিশন নিলে ভালো হতো না? ফিরে আসার একটা সুযোগ তো থাকত।’
অলকের কথায় মুচকি হাসলো রিয়াজ। ও বলল,
‘বন্ধু, সেটা নিয়েছি কাল। কোর্টের একটা অর্ডার নিলাম অ্যাটার্নি ধরে। ফেরার চেষ্টা তো করব। আগে দেখি, প্রপা কী বলে।’
রোমান বলল,

‘শালা, সব কাজই একা একা করে রেখেছ। আমাদের বললে আজ সকালে। এটা তোমার ঠিক হয়নি।’
রোমানের কথার সমর্থন জানিয়ে অলকও বলল,
‘রিয়াজ, আমিও একমত ওর সঙ্গে।’
রিয়াজ বললো,
‘ভুল হয়ে থাকলে মাফ চাইছি তোদের কাছে। আজ যাবার দিন তোরা আমার সঙ্গে থাকবি, এটা মনে থাকে যেন।’
অলক বলল,
‘শালা কাজে যাবার জন্য তৈরি হয়েছিলাম। দাঁড়া রেস্টুরেন্টে ‘সিক কল’ দেব।’
রোমান বলল,
‘আমার তো নিজের স্বাধীন ব্যবসা। সিককল দেয়ার কিছু নেই। গাড়ি চালালে এ সুবিধা আছে।’
কথাটা অলকের উদ্দেশে বলল রোমান। অলক ওর কথা গায়ে মাখলো না। আজ রিয়াজ দেশে ফিরে যাচ্ছে, এমন দিনে ঝগড়া করতে চায় না ও। ও চুপ করে রইল। রিয়াজও চুপ। ওদের দু’জনের মুখ থমথমে। রোমান আর কোনো কথা বলল না। ৩ বন্ধুকে গ্রাস করল এক রাশ বিষণ্নতা।

দশ.

১১ বছর পর দেশের মাটিতে পা রেখে কেমন শিহরণ অনুভব করলো রিয়াজ। রোদ ঝলমলে উজ্জ্বল সকাল। রোদের তেজ আছে। মাঝে মাঝে হালকা দমকা হাওয়া এসে লাগছে। অনেকদিন পর নাতিশীতোষ্ণ বাংলাদেশের গ্রীষ্ম ঋতুর সকালের স্বাদ নিলো রিয়াজ। বিমানবন্দর থেকে বের হতেই ওর মনে হলো, যে বাংলাদেশ থেকে ও যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিল সেই বাংলাদেশ আর নেই। বাংলাদেশ এতটাই বদলে গেছে যে, ওর চিনতে কষ্ট হচ্ছিল। ও বিমানবন্দর থেকে বের হয়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে গেল। এর মধ্যে ওকে কয়েকজন ঘিরে ধরল। ও কোথায় যাবে- এ প্রশ্নে লোকগুলো যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল ওর ওপর। ‘ভাগ্যিস, ওর সঙ্গে হ্যান্ডলাগেজ ছাড়া আর কিছু নেই! নইলে লাগেজ নিয়ে টানাটানি করে দিতো লোকগুলো!’ মনে মনে ভাবলো ও। রিয়াজ আগেই ঠিক করে রেখেছে ও প্রপাদের বাড়িতে প্রথমে যাবে। প্রপাদের বাড়ি রামপুরায়, উলন রোডে। প্রপার সঙ্গে দেখা করে এরপর ও যাবে নিজেদের বাড়িতে। রিয়াজদের বাড়ি রায়েরবাজার। রিয়াজ দেশে ফিরছে এ কথা জানায়নি ওর বাবা-মা ও ভাই-বোনকে। আজ ওকে দেখলে তারা ভীষণ চমকে যাবে। তাদের জন্য সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে। মাকে দেখার জন্য ওর মনটা ছটফট করছে। কিন্তু যার জন্য দেশে ফিরে আসা, তার সঙ্গে দেখা না করে কোথায় যাবে ও?
রিয়াজের বাবা সরকারি চাকরি করতেন, গত বছর রিটায়ার্ড করেছেন। রায়েরবাজারে ওদের ৬ তলা দালান। প্রতি মাসে ভাড়া পায় প্রায় লাখ টাকা। ওর ছোট ভাই রোমেল মাস্টার্স সম্পন্ন করে রাইফেল স্কোয়ারে দুটি দোকান নিয়ে ব্যবসা করছে। ফার্স্টফুড ও গিফট শপ চালাচ্ছে ও। ছোট বোন রিমু ইডেনে পড়ছে। অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। রিমু যখন ক্লাস ফেরের ছাত্রী, তখন দেশ ছেড়েছিল রিয়াজ। আজ ১১ বছর পর ওদের সঙ্গে দেখা হবে। ওকে দেখে তারা কী করবেন, কতটা অবাক হবেন-কে জানে। রিয়াজ আনমনা হয়ে পড়েছিল। একজনের কথায় ওর সম্বিত ফিরে আসে।
‘স্যার, আপনে রামপুরা যাবেন না? আমারে চিনছেন? আমি হানিফ। আপনারে অনেকবার বিমানবন্দরে নামাইছি। চিনছেন? আপনি আজ ফিরছেন জেনে আপনারে নিতে আইছি।’
ট্যাক্সি ড্রাইভার হানিফের মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে রইল রিয়াজ। ও কিছু বলতে পারল না। ও হানিফকে চেনার চেষ্টা করছে। হানিফ ফের বলল,
‘স্যার, গত মাসে আপনি সিংগাপুর গেলেন না? আমিই তো নামাইছিলাম। মনে পড়ছে? এইবার কই গেছিলেন, ব্যাংকক? আমার জ্বর হইছিল, তাই এবার আপনারা নামাইতে পারি নাই।’
রিয়াজ বুঝতে পারছে হানিফ হয় ভুল করছে বা মিথ্যা বলছে। ও কখনো সিংগাপুর বা ব্যাংকক যায়নি। হানিফ তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছে, যেন রিয়াজকে সে ভালো করে চেনে। রিয়াজ একটু অবাক হলেও ওর ভালো লাগলো। বিশেষ করে রামপুরার কথা বলায় ও আকৃষ্ট হলো। রিয়াজের চারপাশে আরো ড্রাইভার আছে। রিয়াজকে ঘিরে তারা দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যে কয়েকজন ওর কাছে জানতে চেয়েছিল ও কোথায় যাবে। রিয়াজ হানিফের দিকে তাকিয়ে বলল,
‘হানিফ, তোমার গাড়ি কোথায়?’

এ কথা বলে রিয়াজ এগিয়ে গেল হনিফের দিকে। হানিফ বিগলিত এক হাসি বিলিয়ে এগিয়ে এসে রিয়াজের হাতের ব্যাগটি নিজের হাতে তুলে নিলো। ও বলল,
'স্যার, আসেন। গাড়ি একটু দূরে রাখছি। বেশি দূরে না। কয়েক কদম হাঁটলেই হইব।'
রিয়াজ হানিফের সঙ্গে হাঁটতে লাগলো। অপরাপর ড্রাইভাররা হতাশ হয়ে ফিরে যেতে লাগলো এয়ারপোর্টের গেটের দিকে। তাদের জন্য মায়া হলো রিয়াজের। হাঁটতে হাঁটতে রিয়াজ হানিফের উদ্দেশে বলল,
'তুমি যাকে মনে করছ, আমি কিন্তু সেই ব্যক্তি নই। আমি কখনো সিংগাপুর বা ব্যাংকক যাইনি। তবে তোমার কথা শুনে আমার ভালো লেগেছে, তাই চলে এলাম।'
হানিফ একগাল হাসলো। ও বলল,
'স্যার, আমি তো আপনারে চিনি না। এয়ারপোর্টে আসলে একটু ট্রিকস করতে হয়। মিথ্যা বইল্যা পেসেঞ্জার নেয়ার চেষ্টা করি। নইলে স্যার, ওই ড্রাইভাররা আমার বারোটা বাজাইয়া দিব।'
'কী রকম?'
'স্যার, তারা এয়ারপোর্টের লিস্টেড ড্রাইভার। প্যাসেঞ্জার তাদের। আমরা বাইরের ড্রাইভার।'
'তোমরা এ কাজ করছ কেন?'
'স্যার, এতে আমাগোও লাভ, আপনাদেরও লাভ।'
বলল হানিফ। রিয়াজ কৌতূহল প্রকাশ করে বলল,
'কিভাবে?'
'স্যার, এয়ারপোর্ট থেকে আপনি ট্যাক্সি নিলে অনেক টাকা লাগতো। আর আমারে টাকা দিবেন মিটার দেইখ্যা।'
এ কথা বলা শেষ হতেই হানিফ একটি হলুদ রঙের গাড়ির সামনে দাঁড়ালো। রিয়াজের ব্যাগটি গাড়ির ব্যাকডালায় রেখে দরোজা খুলে দিয়ে ও রিয়াজের উদ্দেশে বলল,
'ওঠেন স্যার।'
রিয়াজ হানিফের গাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল। ট্যাক্সি ভাড়া নিয়ে রিয়াজের কোনো মাথাব্যথা নেই। ও হানিফের কথায় আকৃষ্ট হয়ে ওর গাড়িতে উঠেছে। ও বলল,
'হানিফ, আমি প্রথমে যাব রামপুরায়। উলন রোডে। সেখানে কিছুক্ষণ থাকব। এরপর যাব রায়েরবাজার। ওয়েটিং চার্জ ও বকশিস দুটোই পাবে। বুঝলে?'
'ঠিক আছে স্যার।'
বলেই হানিফ গাড়ি স্টার্ট দিলো। রিয়াজ প্রপাদের বাড়ির ঠিকানা লেখা একটা কাগজ হানিফের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল,
'হানিফ, এই ঠিকানায় প্রথম যাবে। ওখানে একটু বেশি সময় তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। টাকার জন্য ভেবো না।'
'আচ্ছা স্যার। আপনারে দেইখাই বুঝতে পারছি, আপনি খুব ভালো লোক।'
হানিফের এ কথা গায়ে মাখলো না ও। রিয়াজ এখন প্রপার কথা ভাবতে লাগলো। ওকে দেখে প্রপা কতটা অবাক হবে, এ কথা ও অনেকবার ভেবেছে। আবারো ভাবতে লাগলো। গাড়ি ছুটে চলছে। রিয়াজ নিউইয়র্ক থেকে গ্রামীণ ফোনের একটা সিমকার্ড কিনে এনেছে। গাড়িতে বসে ও সেলফোনে সিমকার্ডটি ভরে নিলো। এরপর ও রাস্তার চারপাশটা দেখতে লাগলো। সবকিছু যেন আমূল বদলে গেছে। রাস্তায়-ফুটপাতে এত মানুষ! ওর মনে হচ্ছে, দেশের জনসংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে। ১১ বছর আগে ও যখন ঢাকায় ছিল তখন এত মানুষ ছিল না বলে ওর মনে হলো। হৈচৈ, গাড়ির হর্ন, ধুলো-ময়লায় রিয়াজ অস্বস্তিবোধ করলেও 'এটাই ওর শহর' বলে নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দিলো। 'সেদিনের ঢাকা আর আজকের ঢাকা যেন এক নয়। ঢাকা আরো হতশ্রী হয়েছে। বেড়েছে ভাসমান মানুষের চাপ।' মনে মনে এ কথা ভাবলো রিয়াজ। আবার এটাও ভাবলো যে, উন্নত ও আধুনিক শহরে অনেকগুলো বছর থাকার পর হঠাৎ করে ঢাকাকে হতশ্রী ও মলিন মনে হচ্ছে। হয়তো ঢাকা শহর আগের মতোই আছে। এতো বছর পর আধুনিক শহর থেকে ফিরে ও হয়তো চিনতে পারছে না ঢাকাকে। তাড়াতাড়িই যেন হানিফ উলন রোডে প্রপাদের বাড়ির সামনে চলে এলো। এত তাড়াতাড়ি উলন রোডে চলে আসবে রিয়াজ আশা করেনি। হানিফের কথায় ওর চিন্তামগ্নতা ভাঙে।
'স্যার, এই যে এইটাই আপনার ঠিকানা। এই বাড়ি।'
রিয়াজের বুকের ভেতরটা ধরফর করে উঠলো। গাড়ির জানালা দিয়ে দেখলো প্রপাদের দক্ষিণমুখী দোতলা বাড়ি। দোতলায় খোলা বারান্দা। খোলা বারান্দায় বেশ কয়েকটি ফুলের গাছ। সবগুলো জানালা মেরুন রঙের পর্দায় ঢাকা। বাড়িটি সম্প্রতি অফ হোয়াইট রঙ করা হয়েছে। চকচক করছে বাড়িটি। বাড়ির ভেতরে বড় জায়গাজুড়ে ফুলের বাগান। রিয়াজের ভালো

লাগলো প্রপাদের বাড়িটি দেখে। ও ট্যাক্সি থেকে নামলো। মনে মনে একবার ওর হ্যান্ডলাগেজের কথা ভাবলো। হ্যান্ডলাগেজে তেমন মূল্যবান কিছু নেই। ও হানিফকে বলল,

'তুমি গলির মোড়ে গিয়ে অপেক্ষা করো। আমি আসছি।'

হানিফ মাথা নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করল। রিয়াজ প্রপাদের বাড়ির গেট দিয়ে প্রবেশ করল। বাড়ির গেটে কোনো দারোয়ান নেই। 'এ ধরনের বাড়িতে দারোয়ান থাকলে মানানসই হয়' কথাটা ভাবলো ও। বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত চারপাশটা দেখে নিলো। দোতলায় বাড়ির কোন ফ্লোরে প্রপারা থাকে ও জানে না। বাড়িটি দেখে মনে হয়নি যে, এই বাড়িতে প্রপারা ছাড়া অন্য কেউ ভাড়া থাকে। রিয়াজ একটু দ্বিধান্বিত হয়ে দরজায় লাগানো কলিং বেলে চাপ দিলো। বাড়ির ভেতরে পাখির শব্দ হলো। শব্দটি মিষ্টি ও রিনরিনে। ও প্রায় এক মিনিট অপেক্ষা করল। এর মধ্যে ও ভাবলো কে দরজা খুলতে পারে। ওর মনে হলো প্রপা দরজা খুলবে। প্রপা দরজা খুললে ওকে দেখার পর প্রপার চোখের দৃষ্টি কেমন হবে- কথাটি নিয়ে ভাবতে গিয়ে ও কেমন ভাবুলতায় ডুবে গেল। ঘোরলাগা ভাবুলতায় ও আবার কলিংবেল টিপলো। দ্বিতীয়বার কলিংবেল বাজার প্রায় ১ মিনিট পর দরজা খুললেন একজন বয়স্ক মানুষ। ভদ্রলোককে দেখে রিয়াজের মনে হলো, তিনি প্রপার বাবা হবেন। প্রপার চোখ ও নাকের সঙ্গে তার চোখ ও নাকের মিল আছে। এ কথা ভাবতেই ওর বুকের ভেতরে আটকে থাকা দুঃশ্চিন্তার পাথরটা যেন নেমে গেলো। প্রপার বাবা সুস্থ আছেন, এটা ওর জন্য ভীষণ স্বস্তিদায়ক। দরজার এক পাট খুলে দাঁড়িয়ে আছেন ভদ্রলোক। তিনি ভরাটকণ্ঠে রিয়াজের উদ্দেশে বললেন,

'কাকে চাই?'

'এটা কি প্রপাদের বাড়ি?'

প্রশ্ন করল রিয়াজ। এবার ভদ্রলোক রিয়াজের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন। এরপর বললেন,

'তোমাকে তো কখনো দেখেনি? কে তুমি?'

রিয়াজকে তিনি 'তুমি' সংবধন করলেন। রিয়াজের ভালো লাগলো। ও বলল,

'আমি নিউইয়র্ক থেকে এসেছি। এটা নিশ্চয় প্রপাদের বাড়ি?'

এবার ভদ্রলোক একটু চমকালেন যেন। তিনি বললেন,

'নিউইয়র্ক থেকে এসেছ? কবে এলে? কী নাম তোমার? প্রপা তো কিছু বলেনি!'

ভদ্রলোকের কণ্ঠে প্রপার নাম শুনে রিয়াজ নিশ্চিত হলো এটা ওদের বাড়ি। ভদ্রলোক যে প্রপার বাবা এটা ওর নিশ্চিত মনে হলো। ও বলল,

'আমি কিছুক্ষণ আগে নিউইয়র্ক থেকে এসেছি। এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি আপনার বাড়িতে এসেছি প্রপাকে চমকে দিতে। ও জানে না, আমার ঢাকায় আসার কথা।'

'ও আচ্ছা। এসো, ভেতরে এসো।'

বলে ভদ্রলোক দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন। রিয়াজ ভেতরে প্রবেশ করল। বিশাল ড্রইংরুম। দু'সেট সোফা বড় বৃত্তাকারে সাজানো। ড্রইংরুম লাগোয়া ডাইনিং স্পেস। ডাইনিং স্পেসে বড় একটা ডাইনিং টেবিল। টেবিলের চারপাশে ৮টি চেয়ার। ড্রইংরুমের দেয়ালে প্রপার একটি ছবি ঝুলছে। এক ঝলক তাকিয়ে এসব দেখলো রিয়াজ। ও সোফায় বসতে গিয়ে বলল,

'আপনি প্রপার বাবা, তাই না?'

'হুম। আমি প্রপার বাবা। তোমার নাম কি? নিউইয়র্কে কী করো?'

'আমার নাম রিয়াজ। আমি নিউইয়র্কে নেটওয়ার্কিংয়ের ওপর গ্র্যাজুয়েশন করেছি। চাকরি করতাম। প্রপা বলেছিল, আপনি অসুস্থ। আপনি কি...।'

'আমার যে বয়স তাতে অসুস্থ থাকাটা স্বাভাবিক। তবে সে রকম অসুস্থ এখনো হয়নি, বাবা।'

কথাটা রিয়াজকে কেমন ভড়কে দিলো। তাহলে প্রপা যে বলেছিল, ওর বাবা ভীষণ অসুস্থ -ওই কথাটি কি সঠিক নয়? রিয়াজ বিস্মিত হলো। ও বলল,

'প্রপা কি বাড়িতে আছে?'

'না, বাবা। তুমি কি প্রপার বিয়ের খবর জানো না?'

প্রশ্ন করলেন প্রপার বাবা। রিয়াজ যেন তার কথা শুনতেই পেলো না। বা কথাটা শুনতে পেলেও ওর ইন্দ্রিয় শক্তি যেন লোপ পেয়ে গেল। ও হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলো প্রপার বাবার মুখের দিকে। প্রপার বাবা ওর মুখোমুখি সোফায় বসতে গিয়ে বললেন,

‘গত সপ্তাহে ওর বিয়ে হয়েছে। মেয়ে মানুষ তোমাদের হয়তো লজ্জায় নিজের বিয়ের কথা জানায়নি। কিংবা হয়তো জানাতে চেয়েছিল, তোমাদের ফোন করে পায়নি। তা প্রপার সঙ্গে তোমার কিভাবে পরিচয় হয়েছিল?’
কথাগুলো গরম সীসা হয়ে রিয়াজের কানে প্রবেশ করছিল যেন। ‘প্রপার বাবা এসব কী বলছেন!’ ও থ’ হয়ে আছে। ওর বুক কাঁপছে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। রিয়াজের স্বাভাবিক চেতনা যেন লোপ পেয়ে যাচ্ছে। ও কী বলবে ভেবে পেলো না। প্রপার বাবা ফের বললেন,
‘অনেক দূর থেকে জার্নি করে এসেছ। প্রপার মা হাঁটতে বেরিয়েছে। তুমি কী খাবে, বলো?’
‘না, না, আমি কিছুই খাব না।’
তার স্বরে ককিয়ে ওঠে রিয়াজ। ওর কণ্ঠস্বর কেমন ফ্যাসফ্যাসে লাগছে। প্রপার বাবা বললেন,
‘খাবে না মানে? নাস্তা খেয়ে যাবে না? নিউইয়র্ক থেকে সরাসরি আমার বাড়িতে এসেছ। মুখে কিছু না দিয়েই যাবে না কি?’
‘না, আঙ্কেল, আমি কিছু খেতে পারব না। এয়ারপোর্টে নামার আগে এয়ারলাইন্সে খেয়েছি। আপনি সত্যি করে বলুন তো প্রপার কি বিয়ে হয়ে গেছে?’
রিয়াজের প্রশ্নে প্রপার বাবা বিস্মিত হলেন। তার কপালের ওপর কয়েকটি ভাঁজ পড়ল। তিনি স্মিত হেসে বললেন,
‘মনে হচ্ছে প্রপাকে চমকে দিতে এসে তুমি নিজেই খুব চমকে গিয়েছ? তুমি কি প্রপার বিয়ের খবর জানতে না?’
‘না, মানে...প্রপা বিয়ে করলে আমি জানব না, এমন তো হবার কথা নয়। তাই...’
‘বুঝেছি, প্রপা তোমাকে বিয়ের খবরটি দেয়নি। এমন হতে পারে। তা তুমি মনে কিছু করো না, বাবা। ঢাকায় এসেই যখন পড়েছ, তখন জানতে পারবে। প্রপাই তোমাকে বলবে।’
‘জ্বি, তা ঠিক। প্রপা এখন কোথায়, আঙ্কেল?’
‘ওরা তো এখন কক্সবাজার। আজই ফেরার কথা। কালও ফিরতে পারে। আমি ওকে তোমার কথা বলব।’
রিয়াজের মুখ দিয়ে শব্দ বের হতে চাচ্ছে না। ওর ভেতরটা ভেঙেচুড়ে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। বুক ফেটে কান্না আসতে চাইছে। প্রপার বাবার সামনে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললে লজ্জার বিষয় হবে। রিয়াজ সোফা থেকে উঠে দাঁড়লো। ও বলল,
‘আঙ্কেল, আমার মা-বাবা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। ১১ বছর পর দেশে ফিরলাম। আমি এখুনি চলে যাবো। কিছু মনে করবেন না।’
রিয়াজের কথায় প্রপার বাবা কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন ওর মুখের দিকে। এরপর তিনি বললেন,
‘তাহলে আগে নিজের বাড়িতে যাও। তোমাকে আটকাব না। কাল ফোন করে জেনে নিও প্রপা এসেছে কি না।’
বললেন প্রপার বাবা। রিয়াজ বলল,
‘আঙ্কেল, প্রপার সেলফোন নম্বরটা কি আমাকে দেবেন। ওকে ফোন করে উইশ করতে চাই।’
‘নিশ্চয়, নিশ্চয় দেবো। একটু অপেক্ষা করো।’
প্রপার বাবা শার্টের পকেট থেকে কলম বের করে টেবিলের ওপর রাখা একটা কাগজে প্রপার সেলফোনের নম্বর লিখলেন। এরপর কাগজটা রিয়াজের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন,
‘প্রপার জন্য দোয়া করো, বাবা। ও যেন সুখি হয়।’
রিয়াজ কাগজটা নিয়ে হাসার চেষ্টা করল। ওর মুখে শুকনো হাসি ফুটল। এই হাসির মধ্যে আনন্দের উচ্ছ্বাস নেই। বরং হাসির আড়ালে গভীর বেদনা মৌনতায় সুষমা ফুটে রইল। রিয়াজ উথলে ওঠা কান্না এবং চোখের কোণে টলমল করা অশ্রুজল সামলাতেই প্রপার বাবার উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে ‘আচ্ছা যাই’ বলে ও হনহন করে প্রপাদের বাসা থেকে বের হয়ে এলো। এ মুহূর্তে রিয়াজ যেন ঝড়ে লণ্ডভণ্ড বিধ্বস্ত এক অন্য মানুষ। ঝড়ের গতিতে ও প্রপাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। এখানে দাঁড়িয়ে একটা বড় করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। এরপর ও ফোন করল প্রপার নম্বরে। রিং বাজলো, কেউ ধরল না। ও আবার ওই নম্বরে ফোন করল। ফোন নম্বর ডায়াল করার কয়েক মুহূর্ত পর রিং বাজতে লাগলো। এবার ফোন রিসিভ করলো প্রপা।
‘হ্যালো..!’
‘কে?’
‘রিয়াজ বলছি।’

ও প্রান্তে নীরবতা। রিয়াজ নিজেকে শক্ত করে নিচ্ছে। তুমুল ভাঙচুর হচ্ছে ওর ভেতর। ওর মনে হচ্ছে পৃথিবীটা ওলট-পালট হয়ে গেছে এবং ওলট-পালট পৃথিবীটা দুলছে। এর মধ্যে ও নিজেকে সামলে রাখার চেষ্টা করল। রিয়াজ প্রপার নীরবতা দেখে বললো,

‘আমি জানি, আমার কথা তুমি শুনছ। প্রপা, তুমি ফোনের লাইনটা কেটে দিবে, এটাও জানি।’

‘তাহলে কথা বলছ না কেনো? ফোন রেখে দাও।’

শান্ত গলায় বলল প্রপা। ওর কণ্ঠস্বর রুক্ষ শোনালো। রিয়াজ অনুনয় করে বলল,

‘একটা অনুরোধ করতে চাই। হয়তো এটাই আমার শেষ অনুরোধ।’

‘কী অনুরোধ?’

‘আমি তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলতে চাই। কথা দিচ্ছি, আর কখনো তোমাকে ফোন করব না।’

‘কথা বলে কী হবে তোমার?’

‘আমার লোকসান ছাড়া আর তো কিছুই নেই। কথা বলতে চাই কিছু প্রশ্নের জবাব খুঁজতে। অমীমাংসিত এক উপখ্যানের হঠাৎ বিপরীতমুখী যবনিকার অন্তর্নিহিত কারণ খুঁজতে।’

রিয়াজের মনে হলো ওর কথায় শরৎ সাহিত্যের আবহ ফুটে উঠেছে এবং ফোনের ও প্রান্তে প্রপা ওর কথায় হয়তো ঠোঁট উল্টিয়ে পরিহাস প্রকাশ করছে। ওসব আজ গায়ে মাখবে না ও। প্রপার সঙ্গে ধৈর্য নিয়ে কথা বলতে হবে। রিয়াজ মনে মনে নিজেকে শক্ত করছে। ও বলল,

‘তুমি কি আমার কথা শুনছো?’

কয়েক মুহূর্ত পর প্রপার কণ্ঠ,

‘শুনছি।’

‘তুমি নিশ্চয়ই ভালো আছো।’

‘হুম্। ভালো আছি।’

‘তোমার ভাগ্যবান হাসব্যান্ড কোথায়?’

‘ও বাইরে গিয়েছে। চলে আসতে পারে যে কোনো সময়। তুমি কী বলতে চাও, বলে ফেলো। ও চলে আসলে আমি ফোন রেখে দেব।’

‘তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ আমি বাংলাদেশে চলে এসেছি?’

‘হুম্। ফোনের নম্বর দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। তা বাংলাদেশে এলে কেন?’

‘নিয়তি আমাকে নিয়ে এসেছে। নিজে আসিনি।’

এ কথার জবাবে প্রপা বলল,

‘রিয়াজ, এসব কথা শোনার সময় নেই আমার।’

‘জানি, তুমি বিরক্ত হচ্ছো।’

‘আমি সত্যিই বিরক্ত হচ্ছি।’

‘আমি দুঃখিত। আগেই তো বলেছি, আমি কিছু বলতে চাই।’

‘রিয়াজ, এরপরও তুমি আমার সঙ্গে কোনো কথা বলতে চাও?’

‘ওই যে বললাম, অমীমাংসিত জীবন কাহিনীর একটা উপসংসার চাই।’

‘শোনো, আমি এখন বিবাহিতা। অন্যের স্ত্রী। আমাকে ভুলে যাও।’

‘চেষ্টা করব ভুলে যেতে। ভুলে যেতে হলেও তো কিছু কথা জানা দরকার।’

‘কী জানতে চাও?’

‘জানতে চাই, আমার কী অপরাধ ছিল? কেন আমাকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলে? বাবার অসুস্থতার কথা বলে ঢাকায় চলে এসে বিয়ে করলে। আমার অযোগ্যতা কি ছিল? আর মিথ্যা কথা বলেছিলে কেন?’

এ প্রশ্নের জবাব দিতে একটু সময় নিলো প্রপা। রিয়াজ লাইনে আছে। ও প্রশ্নগুলোর জবাব চায়। প্রায় ১ মিনিট পর প্রপার কণ্ঠ শোনা গেল। বলল,

‘রিয়াজ, এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না। শুধু এটুকু বলব, আমাকে ভুলে যাও। নিজের জীবন সাজাতে চেষ্টা করো।’

‘এ কথার মধ্য দিয়ে কি আমার প্রশ্নের জবাব হলো?’

‘রিয়াজ, আমি তোমার এ প্রশ্নের জবাব দিতে প্রস্তুত নই। তুমি ফোন রেখে দাও এবং আমাকে আর কখনো ফোন করবে না।’
রিয়াজ একটা বড় করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। ও আজ কোন্ প্রপার সঙ্গে কথা বলছে? এই প্রপাই কি সেই প্রপা, যার সঙ্গে যুগল জীবনের স্বপ্ন মধুর কাব্যময়তায় সময় পার করত। জীবন চলার পথে কেউ কাউকে ছেড়ে যাবে না, এমন প্রতিশ্রুতি প্রপা নির্মোহকণ্ঠে রিয়াজকে দিয়েছিল। অবশ্য প্রপা নায়াগ্রার জলপ্রপাতের সামনে রিয়াজকে বলেছিলো, ‘তুমি সব সময় আমার কছে হেরে যাবে। কখনোই জিততে পারবে না।’ ওকে আরো বলেছিল, ‘পরাজয়টা তোমার ভবিতব্য। জয়টা আমার প্রাপ্য।’ কথাগুলো তর্কের একপর্যায়ে বলেছিল প্রপা, কিন্তু সেদিন রিয়াজ ভাবেনি ওই কথাই ওর জীবনে চরম সত্য হয়ে দেখা দেবে। আজ চরমভাবে ও পরাজিত। শুধু পরাজিত নয়, প্রবঞ্চিতও। এই গ্লানিময় প্রবঞ্চার যন্ত্রণা সহ্য করেও রিয়াজ কথা বলার চেষ্টা করছে। ও প্রান্ত থেকে প্রপা বলল,
‘আচ্ছা, তুমি আমার ফোন নম্বর পেলে কী করে?’
‘আমি তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। তোমার বাবাকে বললাম, আমি তোমার বন্ধু নিউইয়র্ক থেকে এসেছি। তার কাছে তোমার সেলফোন নম্বর চাইলাম, তিনি দিয়ে দিলেন। আমি এখন কথা বলছি, তোমাদের বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে।’
ও প্রান্তে প্রপা কিছু বলল না। রিয়াজ বলল,
‘তোমার স্বামী কী করেন? কিভাবে বিয়ে হলো? স্যাটেল ম্যারেজ?’
‘আমার স্বামী কী করেন, এটা তোমার জানার বিষয় নয়। তবু বলছি, ও চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট। স্যাটেল ম্যারেজ। আর কিছু জানতে চাও?’
‘জানতে চাই, আমার সঙ্গে কি তুমি প্রেম করেছিলে? না কি অভিনয় করেছিলে?’
রিয়াজের এই প্রশ্নের কোন জবাব দিল না প্রপা। ও চুপ করে রইলো। রিয়াজ বলল,
‘প্রশ্নটা কি খুব কঠিন, প্রপা?’
‘তুমি কেন এ প্রশ্ন করছ? আমি তোমাকে কিছু না জানিয়ে বিয়ে করে ফেলেছি, এরপরও নিজেকে বলতে হবে আমি প্রতারণা করেছি কিনা?’
‘অপ্রিয় ও বিব্রতকর হলেও প্রশ্নটার জবাব আমার জানা দরকার।’
বলল রিয়াজ। প্রপার কোনো জবাব না পেয়ে ও বলল,
‘আমি জানি, তুমি এ প্রশ্নের জবাবও দেবে না।’
‘তাহলে কেন এ প্রশ্ন করছো?’
‘মন মানছে না। তাই করছি। কোনো প্রশ্ন না করে তোমাকে অভিবাদন জানাতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু আমি অতটা উদার মানসিকতার পরিচয় দিতে পারলাম না, প্রপা। রক্ত-মাংসের সাধারণ মানুষ আমি। নিজেকে মহৎ করার চেষ্টা করি ঠিক, হতে পারি না। আজ যদি তোমার নতুন জীবনের যাত্রাপথে ফুল ছিটিয়ে দিতে পারতাম, তবে আরো ভালো হতো। অথচ দেখো, বুকের ভেতরে তুমুল ভাঙচুর হচ্ছে। বুকের ভেতরে হু হু কান্না নায়াগ্রার জলপ্রপাতের মতো নামছে। আমি এত সাধারণ এক মানুষ না হয়ে যদি দেবদাসের মতো হতে পারতাম, তাহলে তোমাকে না পাওয়ার কষ্টকে এক ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারতাম। তাই না?’
রিয়াজ যখন এ কথাগুলো বলছিল তখন ওর অজান্তেই যেন দু’চোখ দিয়ে অশ্রুজলের দুটি ধারা গড়িয়ে নামলো। ‘ভাগ্যিস, প্রপা সামনে ছিল না। নইলে রিয়াজের এই নিদারুণ অসহায়ত্ব প্রপাকে অহঙ্কারী করে দিতো।’ ভাবলো রিয়াজ। ও চোখের জল মুছে নিলো। ও প্রান্ত থেকে প্রপা বলল,
‘তুমি বরাবর দেবদাসের সমালোচনা করতে। বলতে দেবদাস প্রকৃত অর্থে ভীতু এবং কাপুরুষ। এখন দেবদাস হতে চাচ্ছ?’
‘আমি এখন যে অবস্থান থেকে কথা বলছি, সেখান থেকে মনে হচ্ছে দেবদাস হচ্ছে প্রকৃত সাহসী প্রেমিক। যে নিজের প্রেমিকাকে হারিয়েও টু শব্দ করেনি। কষ্টকে নিজের মধ্যে লালন করেছে। মৃত্যুকে অনায়াসে আলিঙ্গন করেছে। তবু পার্বতীর জন্য ভেঙে পড়েনি। আর আমি তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য কী আকুলতাই প্রকাশ করেছি। প্রবলভাবে প্রবঞ্চিত হবার পরও বোকার মতো প্রশ্ন করছি, কেন প্রবঞ্চিত করলে? নিজের এই ব্যক্তিত্বহীনতা নিজেকে ভিখারি বানিয়েছে। আর তোমার অহঙ্কারকে করেছে আরো উজ্জ্বল।’
এ পর্যন্ত বলে রিয়াজ থামলো। প্রপা কোনো কথা বলছে না। রিয়াজের মনে হচ্ছে প্রপা যে কোনো সময় ফোনের লাইন কেটে দেবে। ও বলল,
‘তোমাকে আরেকটা কথা বলতে চাই।’

‘বলো।’
‘আমাকে চরমভাবে প্রবঞ্চিত করার পরও তোমার প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই। অনুযোগও নেই। তোমার সামনে আর কোনোদিন আমি দাঁড়াব না। তুমি সুখে থেকো। যেখানেই থাকো, ভালো থেকো।’
‘কেন, অভিশাপ দেবে না?’
জানতে চাইল প্রপা। রিয়াজ বলল,
‘না, তোমাকে করুণা করে নিজের মধ্যে নিজের সহনশীলতা বাড়াতে চাই। জীবনের চরম পরাজয়কে মেনে নিয়ে তোমার জয়কে ম্লান করে দিতে চাই। তোমার অহঙ্কারে আমার পতনের ধূলো মেখে দিতে চাই। তোমাকে ক্ষমা করার চেষ্টাও করব। যদি তোমাকে ক্ষমা করে দিতে পারি, সেদিন থেকে নিজেকে পরিশুদ্ধ এক মানুষ ভাবব। নিজেকে নিয়ে নিজের কাছে গর্ব করব।‘
ও প্রান্তে প্রপা একেবারেই চুপ। রিয়াজের মনে হলো আর কিছু বলার নেই ওর। বলেই বা কী হবে? ওর পুরো জীবনটাই ওলট-পালট করে দিয়েছে প্রপা। প্রপার সঙ্গে কথার বলার মোহ থেকে মুক্ত হতে হবে ওকে। নিজেকে বদলে ফেলার শুরু এর মধ্য দিয়ে শুরু করতে হবে- ভাবলো রিয়াজ। ও বলল,
‘প্রপা, তোমার নামের অর্থ হচ্ছে জলের উৎস। আমি জলের উৎসের কাছে গিয়ে জল চেয়েছিলাম। আর তুমি আমাকে জলপ্রপাতের উপত্যকায় এনে নিচে ঠেলে দিয়েছ। আমার অনির্বার্য পতনে তোমার কী প্রাপ্তি হলো জানি না। তবে আমি এই পতন থেকে ঘুরে দাঁড়াতে চেষ্টা করব। ভালো থেকো।’
এ কথা বলেই রিয়াজ ফোনের লাইন কেটে দিলো। রিয়াজ নিজ থেকে কখনো প্রপার ফোনের লাইন কাটতে পারেনি, আজো পারবে বলে ওর মনে হয়নি। কিন্তু ও ফোনের লাইন কেটে আবার বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। ওর বুক ভেঙে উথলে উঠছে কান্না। বুক সামলালেও চোখ সামলাতে পারল না ও। ওর দু’চোখে নায়াগ্রার জলপ্রপাত নেমে এসেছে যেন। ও রুমাল বের করে এই জলপ্রপাত মুছার চেষ্টা করল না। গভীর বেদনার এই জলপ্রপাত আটকানো যায় না। প্রপাদের বাড়ির গেটের সামনে রিয়াজ অশ্রুসজল চোখে অনেকক্ষণ অকারণে দাঁড়িয়ে রইল।

পাদটীকা : জীবন থেমে থাকে না, জীবন চলে জীবনের নিয়মে। এ গল্পের চরিত্রগুলোর জীবনও থেমে থাকেনি। যুক্তরাষ্ট্রে আর ফিরে যায়নি রিয়াজ। নিউইয়র্কে বাস করছে প্রপা। বিয়ের ৬ মাসের মধ্যে ওর স্বামীও চলে যান নিউইয়র্কে। রোমান অবশেষে বিয়ে করেছে এলিনাকে। অলক জেনিফারের সঙ্গে লিভ টুগেদার করছে। শায়লা নিউইয়র্কে ফিরে গেলেও জয়নালের বিরুদ্ধে মামলা করেনি। রিয়াজ- প্রপার দাম্পত্য জীবনের কথা ভেবে ও কখনো রিয়াজের খোঁজ নেয়নি।